অন্য ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

সিদ্ধার্থ রায়

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
দোল পূর্ণিমা
ফাল্গুন—১৩৫৮

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ানা লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রচ্ছদপট
শ্রীবিমল গোস্বামী

মুদ্রক
শ্রীপুলিনবিহারী টাট
এইচ. এস. প্রেস
৯নং শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন
বরাহনগর

প্রুফ রীডার
শ্রীসত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত

তিন টাকা

এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা ও উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সবই কাল্পনিক। পাঠক-পাঠিকা যদি বাস্তব মানুষের সঙ্গে কোন নামের সাদৃশ্য খুঁজে পান তো তা একান্তই আকস্মিক, ইচ্ছাকৃত নয়। বাংলার রাজনৈতিক জীবনের কৃতবিদ্য দু'একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যে আলোচনা ও মন্তব্য এখানে সেখানে ছড়ানো আছে, তা উপন্যাসে চিত্রিত পাত্রপাত্রীর, লেখকের নয়। কারো প্রতি কোন কটাক্ষ অথবা কাউকে নিন্দিত করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায়ও লেখকের নাই।

লেখক

অন্য ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

এক

দুঃখ ক্ষোভ হতাশা ঘৃণা বিদ্বেষ সব কিছু মিলে একটা জটিল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে শিয়ালদা স্টেশনে।

আর ভোর থেকেই ভীড় জমতে আরম্ভ করেছে অগণিত জনতার। চোখে-মুখে ওদের কি যেন একটা অজানা জিজ্ঞাসা। মনে হয়, যা ওরা কোন দিন কামনা করেনি, অথবা যা ওদের জীবনে কোন কালে ঘটতে পারে ব'লে ওরা আশা করেনি, এমনি একটা কিছু যেন আজ সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। একান্ত অনাহূত অতর্কিতভাবে। কেউ যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না; অথচ আজ তা এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে ইচ্ছে করলেও তা অস্বীকার করা যায় না। তাই অসহায় হতাশা ওদের চোখে-মুখে, বুকে।

রাত্রি থেকেই হাওয়া দিচ্ছিল। বেশ কনকনে শীত। পাতলা কুয়াশা সূর্যকে রেখেছে ঢেকে। আকাশ বিবর্ণ ম্লান। আকাশের এই ম্লানিমাই যেন নেমে এসেছে মানুষের মুখে—শিয়ালদা স্টেশনে সমবেত মানুষের চোখে।

আজকের দিনটা প্রতিদিনের সহজ স্বাভাবিক দিনের মত হ'লে সম্ভবত ওরা কেউ বাড়ীর বাইরে এই ভোরে পা ফেলতো না। খবরের কাগজ

আর চায়ের আরাম আর বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ওদের সকাল আমোদিত হ'য়ে উঠত—প্রত্যক্ষ অকল্যাণের আশঙ্কায় ওদের বুক কেঁপে উঠত না। কিন্তু এ দিনটা আর সব দিনের মত নয়, এ সময়টা আর সব দায়হীন দায়িত্বহীন সময়ের মত সহজও নয়। তাই ওদের আসা।

অকস্মাৎ যেন ওদের সমবেত কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছে। যে কর্তব্য ওরা এতদিন ছিল বিস্মৃত হ'য়ে তাই যেন আজ টানছে; যে প্রীতির প্রতি ছিল চোখ বুজে এবং যে আত্মীয়তার বন্ধনকে ওরা উপেক্ষা করতে পারলেই খুসী হ'তো, তা-ই যেন হঠাৎ ওদের জাগিয়ে দিয়েছে। আর একটি দিনের ভালবাসা দিয়ে যেন ওরা ক্ষতিপূরণ করবে সহস্রদিনেব অবজ্ঞার! একটি মিষ্টি কথায় যেন ভোলাবে সমস্ত তিক্ততাকে!

সেই সুযোগের আশায়ই যেন ছুটে এসেছে সকলে।

কিন্তু, যদিও ওরা সকলে প্রতীক্ষা করছে ঢাকা বা দার্জিলিং এবং আসাম মেলের ও বরিশাল এক্সপ্রেসের, তথাপি একথাটা অনেকের মনে উঁকি ঝুকি মারছিলো যে ট্রেণ না এলেই যেন ভাল। কারণ, ট্রেণ ব'য়ে নিয়ে আসবে যে কুৎসিতকে ও আবর্জনাকে, তার সংগে দেখা না হওয়াই যেন ভাল; যদিও এই কুৎসিতকে সাহায্য করতেই ওদের এখানে আসা। বরং যে অকৃতজ্ঞতায় (যদি একে সত্যই অকৃতজ্ঞতা বলা যায়) ওরা চিহ্নিত, সে অকৃতজ্ঞতায় ওরা আরো বেশ কিছুকাল চিহ্নিত হ'তে রাজী, তবু যাদের প্রতি অবহেলার জন্য ওরা অকৃতজ্ঞ তারা বেঁচে থাক, সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাক। এমনি একটা ভাবধারা অনেকের মধ্যে ক্রিয়া করছে। সত্যই কি ট্রেণ ঐ শুভ সংবাদ নিয়ে আসবে? বিশ্বাস করতে চায় না মন, আশঙ্কায় দোলে। বেঁচে কি নেই, বাঁচার আশা কি দুরাশা?

এই প্রশ্নেরই মীমাংসার জন্যে ট্রেণ আসুক ; ক্ষয় পেয়ে যাওয়ার পরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে সেই অবশেষকে নিয়ে ট্রেণ আসুক। যদি সত্যই কিছু বা অবশিষ্ট থেকে থাকে! তা সে যত ক্ষুদ্র বা ক্ষীণই হোক্ না কেন।

বেলা হওয়ার সংগে সংগে ভীড় ক্রমেই বাড়ছে। এই ভীড়ের মধ্যেই স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র জটলায় সন্নিবিষ্ট হ'য়ে কথা বলছে কেউ কেউ। অনেকে স্থির নিশ্চুপ। অনেকে মনের অস্থিরতাকে গোপন রাখতে না পেরে এদিকে ওদিকে চলা ফেরা করছে, নতুন কেউ এলো, আবার কেউ হয়তো ফিরেও গেল। এমনি করে এই আপাত গতিহীন ভীড়ের মধ্যেও যেন একটা এলোমেলো গতি সঞ্চারিত হয়েছে, আর একটা অস্পষ্ট শব্দের তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব চোখ নানাদিকে ঘুরে ফিরে বার বার স্থির হ'য়ে থামছে স্টেশনের ঘড়িতে। সময় একটানা পার হ'য়ে চলেছে।

স্টেশন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, ঢাকা ও দার্জিলিং মেল কোন ট্রেণেরই কোন সংবাদ নেই।

ঢাকা, দার্জিলিং ও আসাম মেল এবং খুলনা, বরিশাল ও চিটাগাং এক্সপ্রেসে গত দু'তিন দিন যারা এসেছে, তাদের কিছুটা অংশ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের আশ্রয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যাদের কোনই সহায়-সম্বল নেই, অথবা থেকেও যারা উপেক্ষিত, তারা পড়ে রয়েছে স্টেশনেই পূর্ববাংলার বিভীষিকার জীবন্ত স্বাক্ষর রূপে। বিভীষিকার ছাপ তাদের সকলের দেহে মনে সুস্পষ্ট, এমন কি যারা বিস্ময়ে বিমূঢ়, ঘটনার অবিশ্বাস্যতায় হতবাক্, তাদের মধ্যেও কি যে তাদের জীবনে ঘটে গিয়েছে

অথবা কি ঘটেনি তার কিছুই যেন কেউ কেউ বুঝে উঠতে পারছে না ;অথবা যা ঘটে গিয়েছে তা এতো বেশী রকমের বাস্তব যে, যেন তা সত্য হ'তে পারে না। সত্য-স্বপ্নের এমনি একটা অবস্থা মনোজগতে কেউ কেউ বিচরণ করছে।

অনেক বৃদ্ধকে একপাশে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখা গেল—একটা ছেঁড়া নিমা গায়, বহুদিনের না-কামানো দাড়ি, মুখে এবং দেহের নানাস্থানে কালি মাখানো, ছোট ধূলি ও কাদামাখা ধুতি পরণে, ডান হাতে একটা লম্বা কাটা-চিহ্ন ; খানিকটা রক্ত শুকিয়ে চব্ চব্ করছে। বাক্যহীন, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। সঙ্গীসাথী কেউ আছে কি নেই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দেখে মনে হয় তার চারিপাশের ভয়ঙ্কর রকমের সজীব ও কলরব-মুখর পরিবেশ সম্পর্কেও যেন তিনি সচেতন নন। মন তার কোন সুদূর প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সম্ভবত সুদূর অতীতেও। হয় তো কল্পনায় তার মনে ভেসে উঠছে একখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, কয়েকটা লেপা-পোছা ঘর, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, সবুজ ধানী জমি, ক্রীড়াচঞ্চল ছেলে-মেয়ে আর আনন্দ-হাসি-উচ্ছল কোলাহল ; হয়তো ভেসে উঠছে জোয়ান ছেলে আর টুকটুকে ছেলের বৌ-এর কথা। পরক্ষণেই হয়তো সে ছবি মিলিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে বুদ্‌বুদের মতো ; ভেসে উঠছে উন্মত্ত জনতার বিকট চীৎকার, ঝলসে উঠছে ধর্মান্ধ গুণ্ডার ছুরি, তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠছে শিশুদের ও বৌদের ক্রন্দন, নিমেষে তা মিলিয়ে গিয়ে জলে উঠছে আগুনের সর্বগ্রাসী জিহ্বা, সে আলোয় যেন দেখতে পাচ্ছেন তার ছেলের মৃতদেহ—তারপর—তারপর—তিনি নিজে কি করে বেঁচে আছেন তার কোন ছবিই যেন তার মানসপটে ধরা দিচ্ছে না। তারপর হয়তো আরও অধিকতর অস্পষ্ট ছবি তার মনে ভীড় জমিয়ে আসছে, আর সেই ভীড়ে তার চেতনা খেই হারিয়ে ফেলছে·········।

'ইন্‌কোয়ারী'র গা ঘেঁষে একটি পরিবার স্থান নিয়েছে। একটি মাঝ বয়েসী পুরুষ—মাথায় ও বুকে পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাধা, খালি গা, স্থানে স্থানে রক্ত-মাখা নোংরা ধুতি পরণে। মাথায় দু' হাত রেখে কী যেন ভাবছে। পাশেই একজন প্রৌঢ়া বিধবা অবিন্যস্ত কাপড়চোপরে পড়ে আছেন, দেখলে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু সংবাদ নিয়ে জানা গেল ঘুমন্ত নয়, সংজ্ঞাহীন। ইনি এই ভদ্রলোকটির মা। মাঝে মাঝে হায়—হায়—হায় বলে চীৎকার করে ওঠেন, সম্ভবত খানিকটা চেতনা ফিরে আসে, কিন্তু একটু বাদেই তা হারিয়ে যায়। পাশে ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে, ভয়ে জড়সড়। ম্লান ভয়ার্ত চোখে ওরা এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে—তাদের ঘিরে যে বিরাট ভীড় জমে উঠেছে তার উপর যেন ওদের বিশ্বাস নেই, যেন একটা গোপন আতংকে ম্রিয়মাণ। বোঝা যাচ্ছে মা নেই অথবা যাঁকে ওরা গোলযোগের সময় হারিয়েছে; হয় তো দুর্বৃত্ত দলের লাঞ্ছনায় প্রাণ দিয়েছে।

জনতার মধ্য থেকে কে একজন এগিয়ে এসে ওদের হাতে কিছু বিস্কুট দিলো। নিস্পৃহভাবে ওরা দাতার দিকে তাকাল্। তারপর কি যেন কি ভেবে সকলের ছোটটি চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ·····

মাঝখানে একজন মহিলা একাকী বসেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় অজস্র জল ঝরেছে চোখ থেকে, আর তার খানিকটা না-মোছা জল শুকিয়ে মুখখানাকে করেছে অস্বাভাবিক। চোখের দৃষ্টি যে কী ভয়ানক তা বর্ণনা করা কঠিন। যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। সে আগুনে কি ছিল ঘৃণা, ক্ষোভ ও অপরিসীম ক্রোধ? দু' কানেরই নীচের পর্দায় রক্ত জমা হয়ে আছে—হয় তো কেউ টেনে অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং

সে টানে পর্দা ছিঁড়ে গেছে। দু' হাতেও অলঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়ার চিহ্ন; এখানে ওখানে চামড়া ওঠে গেছে এবং রক্ত জমাট হয়ে আছে। মহিলাটি নির্বাক। দর্শকদের মধ্যেই কে যেন বলছিল, ইনি আসছিলেন স্বামীর সংগে ঢাকা থেকে। ট্রেণে দুর্বৃত্তদের আক্রমণ; চোখের উপর স্ত্রীর লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে স্বামীটি ঝাঁপিয়ে পড়েন গুণ্ডাদের উপর, আর সাথে সাথেই ছোরার আঘাতে তার মৃতদেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। তারপরের ইতিহাসের বীভৎসতা কল্পনায় জেনে নিতে হবে। সর্বশেষে ইনি এখানে, কাল এসে পৌঁছেছেন।

দক্ষিণ দিক থেকে ছেলেমানুষী কান্নার এবং কান্নার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলতে চেষ্টা করার আওয়াজ ভেসে আসছিল। ঘন ভীড় সেখানে, দূর থেকে কিছু দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না।

ছেলেটির বয়েস সাত আট। ছেঁড়া প্যাণ্ট পরণে, গায়ে গেঞ্জি। অনবরত কাঁদছে। কেউ কেউ মৌখিক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুতেই সে প্রবোধ মানছে না। বাপ মাকে হারিয়ে কাঁদছে, কি পূর্ব বাংলাকে পিতৃহীন মাতৃহীন ভেবে একলাই কলকাতায় এসেছে, বোঝা গেল না। অবশেষে একজন সহৃদয় ভদ্রলোক ওর হাত ধ'রে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'আমায় বল খোকা তোর বাপ-মা কোথায়, তোর বাড়ী কোথায়?" ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কিন্তু কি বলল তা কারো বোধগম্য হলো না।

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'খিদে পেয়েছে? খাবি?'

উত্তরে ছেলেটা হাউ-মাউ করে কাঁদলই শুধু।

অবশেষে ভদ্রলোক ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে বললেন, 'আয় আমার সংগে আমার বাড়ী।'

এমনি অসংখ্য মানুষ, ঘরবাড়ী ছাড়া পালিয়ে-আসা মানুষ, সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার বলি-হওয়া মানুষ, শিয়ালদা স্টেশনের বুকে অকাতরে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রচলিত ধর্ম পরিচয়ে এরা হিন্দু।

প্রচলিত ধর্ম পরিচয়ে যারা মুসলমান তারা এই ভীড়ের মধ্যে নেই। অথবা থাকলেও চেনার যো নেই। কেননা, যে পোষাক পরিচয়ে তাদের সহজে চেনা যায়—অর্থাৎ পাজামা ও লুঙ্গিতে—সে পোষাক এই ভীড়ে কারো দেহেই চোখে পড়ছে না। এ সময়টায় কলকাতায় লুঙ্গি-পাজামা পরা নিরাপদ নয় কোন মতেই। পুলিশ পাহারায় একদল মুসলমান ট্রাকে করে স্টেশনে এলো। ক্ষয়ক্ষতি আর ভয়ের চেতনায় তাদের চোখ মুখ শুকনো। একে একে নামছে ট্রাক থেকে নিরীহ মেষশাবকের মতো। হয় তো এরা পুড়ে-ছাই-হয়ে-যাওয়া কোন বস্তীর ধ্বংসাবশেষ, নয় তো কোন মার-খাওয়া গ্রামের অবশিষ্টাংশ। যা কিছু অবলম্বন আগুন ও লুটপাটের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে, তা পুঁটলি-পাটলিতে বেঁধে নিয়ে চলেছে। চলেছে সম্ভবত কোন অজানার সন্ধানে। কারু মুখে টু শব্দটিও নেই। ভয়ে যেন চোখ বুজে আসছে। দুধারে পুলিশ, মাঝখানে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে প্ল্যাটফরমের দিকে। আর অপেক্ষমান জনতার মধ্যে এই চলে যাওয়ার দলের উদ্দেশে অশ্রাব্য কটূক্তি বর্ষিত হতে লাগল। অক্ষম আক্রোশ যেন ফেটে পড়ল। যেন পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনতার সর্বপ্রকার কুনীতির জন্য এরাই সর্বাংশে দায়ী। এমনিভাব দেখাতে লাগল অধিকতর উৎসাহী ব্যক্তিরা। হাতে পেলে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে মনের ঝাল মেটাতে চাইলেন কেউ কেউ।

পাহারারত পুলিশরা মৃদু হাসল।

এই ভীড়ের মধ্যে থেকে প্ল্যাটফরমের ভেতরে যতটা দেখা যায়, তাতে মনে হলো যেন আগে থেকেই আরও মুসলমান সেখানে আশ্রয় নিয়েছে; হয় তো পূর্ব-বাংলাগামী কোন ট্রেণের প্রতীক্ষা করছে ওরা। ধীরে ধীরে সেখানেও ভীড় কিছুটা বেড়েছে। কেউ কেউ করুণ চোখে বাইরের জনতার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। লোহার রেলিং ভেঙে কখন বুঝি ঐ জনতা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এই আশংকা তাদের মনে। পুলিশ পাহারা আছে অবশ্য, কিন্তু তারা জানে তাতে আশ্বাস পাওয়া যায় না। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখেছে, আজকালকার রেলিং-এর প্রতিরোধটাও মোটেই অনতিক্রম্য নয়।

এরা কোথা থেকে এসেছে সেটা অজানা নয় কারো। কলকাতা ও সহরতলীর বস্তী, হাওড়া ও চব্বিশ পবগণার গ্রামে গ্রামে তাদেবই বাপ-চাচা ভাই-বোনের রক্তের এবং এদেরই বিষয় সম্পত্তির ভস্ম দিয়ে এ পক্ষের সাম্প্রদায়িক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই পোড়ো ভিটায় ঘর না বেঁধে এরা নতুন করে ঘর বাঁধতে চলেছে পূর্ব বাংলায়। নিজেব বাস্তু যদি না এদের রক্ষা করে তো পুরোনো আশাকে ভর করে থেকে লাভ কি? তাই উপস্থিত মৃত্যুকে এড়িয়ে এরা আশা করল এক নূতনকে।

এরাই পশ্চিম বাংলার বীভৎসতাকে বহন কবে নিয়ে চলেছে পূর্ব বাংলায়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে আসা-যাওয়ার জন্যে এরা দায়ী নয় কোনমতেই। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার ভেতব দিয়ে কোথায় কোন কোন মেঘ জড় হয়ে চলেছে কে তার সংবাদ রাখে!

অপেক্ষমান ভীড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে পথ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কল্যাণ—কল্যাণ বসু। ছিপ্ছিপে গড়ন, তামাটে গায়ের রং, দেখতে শুনতে বেশ লম্বা। তার উপর ট্রাউজার পরণে থাকায় স্বাভাবিক থেকেও একটু বেশী রকমের লম্বা দেখাচ্ছে। ব্যাক্‌ব্রাশ করা চুল, আর কনুই পর্যন্ত হাতা-গুটানো ময়লা সাদা সার্ট গায়। বেশ চট্‌পটে ভাব চলার মধ্যে, আর চোখে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। কাঁধ থেকে ক্যামেরা ঝুলছে, বাঁ-হাতে নোট বই আর ডান হাতে পেন্সিল। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ।

কল্যাণ রিপোর্টার। কি করে সে সাংবাদিক-রিপোর্টার হলো সে কাহিনী—আমাদের কাছে অবান্তর। তার অতীত জীবন থেকে এটুকু জানা থাকলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, ছোটবেলা থেকেই সে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখতে পেরেছিল। সেই সময় থেকে বহু সুদক্ষ কর্মী ও চিন্তা-নায়কদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের সাহচর্য এবং পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে সে একটা স্থিরনিশ্চিত জীবনদর্শন গড়ে তুলেছে। সেই আদর্শের চোখ দিয়েই সে পৃথিবীর দিকে তাকায় এবং সব কিছুর মূল্য বিচার করে।

এই আদর্শ যখন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে এক হয়ে গেল, তখন তার অন্য দিককার বন্ধন গেল শিথিল হয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সে, নিজ পরিবারে থেকে অল্প আয়াসে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ওর পক্ষে অসম্ভব হোত না। কিন্তু সে পথ ও নিজেই বর্জন করেছে। স্নেহের আকর্ষণ এবং বাবার আদেশ ওকে আটকায়নি। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে কয়েক বছর বিনা বিচারে আটক থেকে ও বাইরে এসে রিপোর্টারি ক'রছে। বাড়ীঘরের কোন খোঁজ বড় একটা নেয় না, ওরাও নেয় না। মেসে থাকে এবং চাকুরীর অবসরটা কাটায় সে

পঠন-পাঠনের এবং রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সংগে আলোচনায়, তর্ক-বিতর্কে ও আড্ডায়।

কিছুদিন ধরে কাজের চাপ বেড়ে গেছে। কলকাতা ও সহরতলীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আত্মপ্রকাশ করায় বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে, কোথায় সত্য সত্যই কি ঘটছে, কি ঘটেনি আর উড়ো কথার কোন অংশটা অতিরঞ্জিত। এই কাজে উন্মাদনাও আছে বেশ। কত বিচিত্র-ভাবে মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, কত বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে! তাই যে সংবাদ ওর সংগ্রহ না করলেও চলে, যে জায়গায় ওর যাওয়ার প্রয়োজন নেই, সে সংবাদও সে সংগ্রহ করে, সে জায়গায় থেকেও একটা নিখুঁত ফটো তুলে নিয়ে আসে। অবশ্য সে জানে যে চোখ দিয়ে সে ঘটনাকে দেখেছে, যে অনুভূতি ওর অন্তরে খেলে যায় এবং যে ছবি সে ক্যামেরায় ধরে নিয়ে আসে, তার কোনটাই ওদের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে না। কেননা, পত্রিকার মালিকের ব্যবসায়ী বুদ্ধি, সম্পাদকের খেয়ালখুসী এবং সর্বোপরি বার্তা-সম্পাদকের রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধির ছকে ঢালাই করে কল্যাণকে লেখা সাজাতে হবে। এই ছাঁচে ঢালাই হয়ে যে ছবি, কাহিনী ও সংবাদ প্রকাশিত হবে, কল্যাণ হয়তো তাকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করতেও কুন্ঠিত হবে, তথাপি সে যা শোনে তা নোটবই-এ টুকে নেয়, যা দেখে তা মনে ও ক্যামেরায় গেঁথে নেয়। হয়তো ভবিষ্যতে কোন একদিন তা কাজে লাগতেও পারে। আর তা ছাড়া বয়ে-চলা জীবনকে তো জানলাম চিনলাম—এই সান্ত্বনা দেয় কল্যাণ নিজের মনকে।

কয়েক দিন ধরে কল্যাণ সকাল-বিকাল রোজ স্টেশনে আসে। অনেকক্ষণ থাকে। ভীড়ের সংগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দেয়, এবং বহু বিচিত্র ভাবের আবর্তে স্নান করে। মাঝে মাঝে কোন মজার গল্প, চোখা মন্তব্য বা অর্থপূর্ণ সমালোচনা কানে গেলে চট্ করে তা টুকে নেয়,

অবাক হয়ে বক্তার মুখের দিকে তাকায়, আবার ভীড়ের সংগে মিশে যায়। ভারি আনন্দ হয় ওর ; মনে হয়, যেন এর মধ্য থেকেই সে অনুভব করছে জীবনের চঞ্চল প্রবাহকে। সে বিস্মিত হয়, মনে মনে সংকল্প করে এই মানুষকেই সে সৃষ্টি করবে।

আজও তার প্রতিদিনের কর্তব্যের টানেই সে স্টেশনে এসেছে। এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, এখানে ওখানে থেমে কান পেতে কথা শুনছে। পরিচিত বন্ধু বা লোকজনের সংগে দেখা হলে মৃদু হেসে ও অল্প কথাবার্তা বলে চলে যাচ্ছে। এই বিরাট ভীড়ের মধ্যে কোথায় কে কি বলছে, তার একটি কথাও যেন সে হারাতে চায় না, প্রত্যেকটি শব্দ মনে গেঁথে নিতে চায়। এমনি ব্যস্তসমস্ত ভাবখানা।

কলকাতার আবহাওয়া রীতিমত উত্তপ্ত। আর শুধু কলকাতা কেন, এই উত্তাপের ধাক্কা লেগেছে ভারতের সর্বত্র। জনমন ভীষণ ক্ষুব্ধ—এই আসা-যাওয়ার একটা স্থায়ী মীমাংসা এবার চাই-ই। কথাবার্তা আলাপ আলোচনার মারফত এই ক্ষোভ ব্যাপ্তি লাভ করতে আরম্ভ করেছে। আর জনসাধারণের চেয়ে জননেতা এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় বা প্রথম স্থানীয় ব্যক্তিরাই যেন বিক্ষুব্ধ হ'য়েছেন বেশী। তাঁদের বিবৃতি বক্তৃতা ইত্যাদি পাঠ করে জনসাধারণ স্পষ্ট স্থির করে নিয়েছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য, আর এ ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের কোন পথই নেই।

'যুদ্ধ হবেই, এটা আর শুধু কথার কথা নয় ধরে নেবেন,' বলে ভদ্রলোক বিড়িতে টান দিলেন। কল্যাণ চেয়ে দেখলো বক্তা একটু গোলগাল ধরণের, বেঁটে ; বয়েস চল্লিশের উপরে; কথাবার্তা ও চলনচালনে বেশ একটা সস্তা ভারিক্কির ছাপ ; পায়ে মেটে রং-এর কেড্‌স যা কোন এক

সময়ে সাদা ছিল ; গায়ে সাদা ময়লা শার্ট, তার উপর বহু দিনের পুরোনো এ্যাণ্ডির চাদর জড়ানো ; অর্থাৎ এমনি একজন লোক যাদের খেলার মাঠের গেটে, রেস-কোর্সে, শ্যামবাজারের থিয়েটার-সিনেমার ভবনের বারেন্দায় এবং চায়ের দোকানে সদাসর্বদা দেখা যায় ; যারা দায়ে পড়ে পায়ে ধরবে আবার প্রয়োজনে পেছন থেকে ছুরিও চালাবে ; আবার যাদের গোপালদা, পাঁচুদা হারাণদা, হাবুলদা, ক্যাবলাদা যে কোন নামেই ডাকা চলে।

পাঁচজনকে শুনিয়ে হারাণদা বলছেন, 'বুঝতে পারছেন না, চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে কেউ ঠিক থাকতে পারে না কেউ ঠিক থাকবে ? তা ছাড়া পণ্ডিতজীর মত লোক, প্যাটেলের মত লোক, তাঁরা কি দেখছেন না কোথায় কি হচ্ছে ? আপনি কি মনে করেন সব দেখে শুনে তাঁরা চুপ করে থাকবেন ?' 'কিন্তু—' কে একজন সংশয় প্রকাশ করে কি বলতে চাইছিল। বাধা দিয়ে হারাণদা বললেন, 'এর মধ্যে আর কিন্তু ফিন্তু নেই, সব জলের মত পরিষ্কার। পাকিস্তান হিন্দুদের মেরে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, গভর্ণমেণ্ট এর জবাব দেবেই, দেখে নেবেন।'

'পণ্ডিতজী কিন্তু কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনদিন যুদ্ধ হবে না।'

'আবার তিনিই তো বলেছেন ভালয় ভালয় পাকিস্তান এসব বন্ধ না করলে ভারত গভর্ণমেণ্ট অন্য পন্থা অবলম্বন করবে, সেটা কি লক্ষ্য করেন নি ? আর দেখেছেন তো কারিয়াপ্পা কলকাতায় এসেছেন, এখানে ওখানে যাচ্ছেন, একটা প্রেস কনফারেন্সও করেছেন কিন্তু খবরের কাগজে এর কোন সংবাদ বেরোয়নি, এসবের মানে বুঝতে পারেন ?'

আরেকজন হারাণদা ফোঁড়ন কাটলেন, 'মানে তো ফর্সা। এবার পাকিস্তান বুঝবে আগুন নিয়ে খেলার মজাখানা, হ্যাঁ।'

'আমার কিন্তু মশাই জহরলালের উপর বিশ্বাস নেই।'

'জহরলালের পেছনে সর্দার আছে এটা ভোলেন কেন দাদা।' একটু থেমে হারাণদা বললেন, 'দেখছেন তো দেশ কেমন তেতে গিয়েছে। এবার একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না। গভর্ণমেণ্ট না করুক পাবলিক করবে, আমরাই করবো। আপনিও করবেন। পড়েছেন তো'——' পত্রিকা আজ কি লিখেছে?' এই বলে হাতের ভাঁজ-করা পত্রিকাটি খুলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে পড়ে শোনালেন: "পূর্ববাংলার অবস্থা বর্ত্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, আর নীরবে বসিয়া থাকিবার সময় নাই। আজই এই মুহূর্তেই কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। মিষ্টকথায় পাকিস্থানী কর্ণধারদের বোধোদয় হইবে এ আশা দুরাশা। তাহাদের কর্ণ ধরিয়াই শিক্ষা দিতে হইবে। কুকুরকে মুগুর মারিয়াই ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। ভারতের সম্মুখে ঐ একমাত্র পথই খোলা রহিয়াছে। একমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীই পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের বাঁচাইতে পারে।" পড়া শেষ করে হারাণদা মন্তব্য করলেন, 'এ হচ্ছে সাচ্চা কথা', এবং শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকালেন, সম্ভবত সমর্থনের আশায়। অনেকে সায়ও দিল।

কিন্তু হতাশায় বিমর্ষ প্রতিবাদীটির মন তখনও সংশয়াতীত হয়নি। তিনি বললেন, 'কিন্তু, মশাই, ভয় হচ্ছে, যাদের বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ হচ্ছে তারা হয়তো কেউ বাঁচবে না।'

হারাণদা সম্ভবত সেই প্রশ্নটা আশা করেন নি। খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'বলেন কি মশাই, এ কদিনের ব্যাপার। আপনি কি মনে করেন পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে দু'দিনের বেশী লাগবে? একটা কুকুরের যে সাহস আছে, ওদের তো সে সাহসও নেই। ইণ্ডিয়ান আর্মি পাকিস্তানে ঢুকবে আর অমনি দেখবেন সব ল্যাজ গুটিয়ে পিছটান দিয়েছে। ওদের মুরোদ তো……'

'কিন্তু ঐ দুদিনেরই তো ভয়, দাদা।'

'তা কি করবেন বলুন। যুদ্ধ করতে গেলে আপনি তো আর আশা করতে পারবেন না যে আপনার একটি সৈন্যের গায়ে একটি আঁচরও লাগবে না। কিছু সৈন্য যাবেই, কিছু লোকও যাবে। কিছু গিয়েও যদি বাকী সব বাঁচে তো ভালই বলতে হবে, কি বলেন মশাই?'

'কিন্তু ভয় হচ্ছে উল্টোটা না হয়।'

'না না মশাই কিচ্ছু হবে না। চারদিক থেকে আক্রমণ হলে কি করবে ওরা। কে রুখবে শুনি? ঐ আনসাররা? কাপড়ে চোপড়ে হেগে দেবে মশাই, বলে দিলুম।'

সকলেই হাসল, বেশ একটু আনন্দের সঙ্গেই। আর হারাণদা বিজ্ঞের মত সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন।

কল্যাণও হাসল। কিন্তু বিস্মিত হলো না। লাল কালিতে ছাপানো ও হাতে-লেখা হাজার হাজার পোষ্টার সে দেখতে পেয়েছে সারা কলকাতার বুকে লাগানো। "পণ্ডিতজী পূর্ববাংলায় চলুন, আমরা প্রস্তুত", "বাঙ্গালী! এখনো কি ঘুমাইবে? তোমার মা-বোন লাঞ্ছিত, রক্ত দিয়ে তার শোধ লইবে না! এখনই পূর্ববাংলায় চল," "পূর্ববাংলায় আগুন লেগেছে, হিন্দু হিন্দুকে বাঁচাতে প্রাণ দাও"; ইত্যাদি ধরণের পোষ্টারে সারা কলকাতা আচ্ছন্ন। পোষ্টারের নীচে বিশেষ একটা সংগঠনের নাম। যুদ্ধের আলোচনা শুনতে শুনতে স্বভাবতই এসব পোষ্টারের কথা কল্যাণের মনে পড়লো। মনে মনে হাসল সে। বাংলাকে ভাগ করে এরা একদিন বাংলার সংস্কৃতি ও বাঙ্গালীকে বাঁচাতে চেয়েছিল, আজ আবার পূর্ববাংলা দখল করে বাংলার মান সম্ভ্রম সংস্কৃতি রক্ষা করতে চাইছে। অথচ দুটো কার্যক্রম যে কতখানি পরস্পরবিরোধী, তার বিচার সম্ভবত এরা কোন কালেই করবে না।

ওদিকে আলোচনা বেশ চলছিল। একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় কল্যাণ সম্ভবত কয়েকটা কথা শুনতে পেল না। কিন্তু এ ভাবটা কেটে যাওয়া মাত্রই সে ভীষণ মনোযোগী হয়ে উঠল।

হারাণদা বেশ গরম হয়ে উঠেছেন। বলছেন, 'এ কথনো হয়, ওরা সব সময় অত্যাচার করে যাবে, আর আমরা মুখ বুজে তা সহ্য করে যাব। এ কখনও সম্ভব ? না বেশীদিন সহ্য করা চলে ?'

এক সংগে বহু কণ্ঠ থেকেই আওয়াজ হলো, 'সে তো ঠিক কথা !'

'সেই জন্যেই তো গান্ধীজীর নীতি আমাদের কোনদিনই বিশেষ ভাল লাগেনি। একমাত্র ওঁর জন্যেই তো আজ পাকিস্তান এত লাফালাফি করছে। নইলে গোড়া থেকেই প্যাটেল যে পথ ধরেছিল, পাকিস্তান ফুঁয়ে উড়ে যেত মশাই। গান্ধীই তো সর্ব্বনাশ করলে। সত্যি কথা বলতে কি মশাই, আমার মনে হয় গান্ধী হিন্দুর আর বাংলার যে ক্ষতি করেছে তার তুলনা হয় না।'

কে একজন বললে, 'ব্যাটা মরেছে ভালই হয়েছে।'

হারাণদা একটানে বলে চলেছেন, 'নইলে ওদের কি আছে বলুন, না দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওরা কিছু করেছে ? স্বাধীনতার জন্যে লড়ল হিন্দুর বাচ্চা, গুলি খেল, মরল, জেল খাটল হিন্দুর বাচ্চা। অথচ কিছু না করে ওরা পেল পাকিস্তান। অথচ—

'এটা বৃটিশের কারসাজি।' একটা মন্তব্য হ'লো।

'বৃটিশের কারসাজি বা যা-ই বলুন, আমার মনে হয় গান্ধীর হাত ছিল অনেকটা। নইলে কখ্খনো তা হ'তো না। অথচ কি রকম বেইমান দেখুন, হিন্দুর রক্তে পাকিস্তান পেলি আর আজ কিনা হিন্দুর বুকেই ছুরি চালাচ্ছিস। নেমকহারাম জাত কোথাকার।' বলে হারাণদা একটু দম নিলেন।

হারাণদার সুর টেনে আর একজন আরম্ভ করলেন, "সে কথা আর বলতে। পাকিস্তানে পয়সাওয়ালা লোক যে দুচারটে আছে সবই তো হিন্দু। তারপর ইস্কুল বলুন, কলেজ বলুন সবই তো হিন্দুরা করেছে। মাষ্টার প্রফেসার সবই তো হিন্দু। তোদের মধ্যে লেখাপড়া জানে কটা লোকে ? হিন্দু না হলে এক পা চলতে পারতিস্ না। আর আজ কিনা—'

ভদ্রলোক কথা শেষ করার আগেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন উত্তেজিতভাবে বলল, "হিন্দু আর তা সহ্য করবে না। আজ আর গান্ধী নেই যে এই বেইমানদের বাঁচাবে।"

'ঠিক। আজ আর গান্ধী নেই যে শালাদের বাঁচাবে।'—বক্তা হারাণদা।

'শালারা বুঝতে পারছে না ব্যাপারখানা কি হচ্ছে, যখন বুঝবে তখন আর পাকিস্তান থাকবে না।'

আধ মিনিট চুপচাপ। তারপব শ্রোতাদের মধ্যে একজন বেশ একটু চিন্তাশীল ভংগিতে বলল, 'আচ্ছা, যুদ্ধে তো ওরা হারবেই। ওরা কি বুঝতে পারছে না হারলে ওদের কি অবস্থাটা হবে ?'

পূর্বেকার বক্তাদের মধ্যে একজন উদ্বাস্তুদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বুঝতে পারলে কি আর এসব ঘটত ?'

কিন্তু হারাণদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'মশাই, আপনিও যেমন। বুঝতে পারবে, মাথায় ঘিলু থাকলে তো বুঝবে ? কি সব লোক গভর্ণমেণ্ট চালাচ্ছে দেখছেন না ?'

চৌদ্দ পনের বছরের একটি ছেলে, সম্ভবত কৌতুক করার জন্যেই বলে উঠল, 'একথা তো ওরাও আমাদের সম্পর্কে বলতে পারে !'

উক্তিটা কেউ প্রত্যাশা করেনি, আর কারো মনোমতও হয়নি। তাই একই সংগে অনেকগুলো অগ্নিবর্ষী চোখ ওর উপর এসে পড়ল। আর

আওয়াজ শোনা গেল 'কে ? কে ? ওটা কে মশাই ?' ছেলেটির বয়েস আর একটু বেশী হ'লে সম্ভবত জনতা খুশী হ'তো। কিন্তু নেহাৎই ছেলেমানুষ বলেই জনতা যেন একটু দমে গেল। যারা বিড়্ বিড়্ করছিল তাদের স্তব্ধ করে হারাণদা বললেন, 'এখনো তো গোঁফ গজায়নি, এর মধ্যেই ডেঁপোমি সুরু করেছ? আমিও বলে দিলুম, সব জায়গায় ডেঁপোমি দেখাতে এসো না, বুঝলে? নইলে ডেঁপোমি ছাড়িয়ে দেব!'

ছেলেটি কোন কথা বলল না। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'লো না যে সে ভয় পেয়েছে; বরং ওর ঠোঁটে চোখে যেন এক ঝলক বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে সে হারাণদার পানে একবার তাকাল, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

কল্যাণ ভাল ক'রে ছেলেটিব চলে-যাওয়া লক্ষ্য করল এবং ওর মন্তব্যটা খাতায় টুকে নিল।

ট্রেণের তখনো কোন উদ্দেশ নেই। কল্যাণ আরও কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে পূর্ব বাংলা বিলিফ কমিটির শিয়ালদা কেন্দ্রে উপস্থিত হ'লো। ৯ নং প্লাটফর্মের গায়ে-লাগানো গুদাম ঘরে পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটি ও অন্যান্য সেবা সংঘের অফিস। অত্যন্ত ভীড় সেখানে।

অমিয়—অমিয় দাস—কাজ করছিল এক মনে। কাজ মানে কতকগুলো কাগজপত্র গভীরভাবে পরীক্ষা করছিল, আর তার পাশেই দাঁড়ানো দুটো ছেলে মাঝে মাঝে অমিয়র প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। পাশের একটা টেবিলে নানা অষুধপত্রের শিশি, কৌটা, কাগজের বাক্স ইত্যাদি। সেখানে একজন তরুণ ডাক্তার পূর্ব বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু রোগীদের পরীক্ষা করে চটপট ব্যবস্থাপত্র লিখছেন, এবং দুজন স্বেচ্ছাসেবক সে ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী

অসুধ বিলি করছিল। সংগের আরো একটা টেবিলকে ঘিরে কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি চলছিল। সেখানে গলদঘর্ম দুজন স্বেচ্ছাসেবক গুঁড়ো দুধ বিলি করছে। কয়েকজন এই ছোট্ট রিলিফ কেন্দ্রের জনসমাবেশকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে; আর একটি বার তেরো বছরের ছেলে ফোন ধ'রে আছে।

হাঁ, অমিয়র সন্ধানেই কল্যাণ এসেছে। অমিয় পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটির শিয়ালদা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুজনের পরিচয় ছেলেবেলায়। তারপর বহুদিনের সাথীত্ব ও কর্মের ভিতর দিয়ে সে পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কি করে সেটা হলো বোধ হয় কেউ তা বুঝে দেখেনি কারণ, বিশ্লেষণের জিনিস আর সেটা নয়, জীবনের মতো মেনে নেওয়াব জিনিস। তাই স্থানের ব্যবধানকে ও ব্যক্তিগত দেখা-সাক্ষাতের অভাবকে —যা সাধারণ সখ্যতাকে বিনষ্ট করে দেয়—ছাপিয়ে আদর্শের বন্ধন তাদের বহু দূরে থাকলেও সর্বদা কাছে টেনে রাখে।

একটি ভলাণ্টিয়ার কল্যাণের প্রতি অমিয়র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ম ডাকলো, অমিয় দা—

অমিয় চোখ না তুলেই বলল, 'হুঁ হুঁ এ জায়গায় লেখাটা তো ঠিক হয়নি; পরশুদিন বরিশাল এক্সপ্রেসে যে ৬৭ জন আহত এসেছে, তাদের ক'জন এখন ষ্টেশনে আছে, আর কোন হাসপাতালে ক'জন গিয়াছে তা তো লেখোনি। হিসেব পাওনি নাকি? বলে মুখ তুলতেই ছেলেটি চোখ দিয়ে অমিয়র দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে কল্যাণের দিকে। কল্যাণ হাসছিল, স্নেহভালবাসা-মাখানো হাসি। বললে, "খুব ব্যস্ত নাকি রে?'

'না—এই দাঁড়া একটুখানি।' তারপর আগের মত ক'রে বলল, 'দেখো, ঐ হিসাবটা পাও কিনা; পেলে এখানে বসিয়ে দিয়ো। শঙ্কর,

তোমার রিপোর্ট তৈরী হয়েছে ? কাল কোন ট্রেণে কত আহত এসেছে, বুলেটের আঘাত কারো শরীরে আছে কিনা, কত লোককে আমরা attend করেছি ইত্যাদি সব দিয়েছো ?'

ছেলেটি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। 'আর কত পাউণ্ড দুধ খরচ হ'লো, কত জামা-কাপড় দেওয়া হয়েছে, সব ঠিকঠাক দিয়েছো তো ?

'হ্যা'।

'বেশ, সব এক সংগে সেণ্ট্রাল অফিসে পাঠিয়ে দিও।' তিন-চারখানা কাগজ দস্তখত করে অমিয় জিগ্যেস করলে, 'শঙ্কর আজ কে কোন ট্রেণ attend করবে সব ঠিক আছে, আর যাদের যাদের ডিউটি সবাই এসে পৌঁছেছে ?'

শঙ্কর ঘাড় নাড়লে।

'আর দেখো তুমি কিন্তু আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যেওনা। আমি একেবারে খাওয়া দাওয়া করে একটু জিরিয়ে ফিরবো। কেমন ?'

'আচ্ছা'।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে অমিয় মেডিক্যাল ইউনিটের অমরকে ডেকে বললে, অমর কোন কোন অষুধ ফুরিয়ে গেছে আর কি কি নতুন অষুধ লাগবে চটপট একটা লিষ্ট করে দাও দিকি; আর ফোনে সেণ্ট্রাল অফিসে খবর দাও অথবা কাউকে না হয় পাঠিয়েই দাও, তাড়াতাড়ি চলে আসবে। কেমন ?'

শঙ্কর বলল, 'অমিয়দা মণ্টু আমাদের সংগে এখানে কাজ করতে চায়।'

'কোন মণ্টু ?'

শঙ্কর ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলে, অমিয় বললে, 'ও তুই পারবি ? বেশ বেশ দেখ।' কল্যাণ দেখলো সেই ছেলেটি, হারাণদার গাল-খাওয়া

ছেলেটি। তারপর ছেলেটির পিঠ চাপড়ে হাত পা টানা দিয়ে অমিয় কল্যাণকে ডাকল, 'আয়।'

একটু ফাঁকা জায়গায় এসে অমিয় পকেট থেকে বিড়ি বের করলে একটা।' বাধা দিয়ে কল্যাণ বললে, 'আজ না হয় একটা সিগারেটই খা।' সিগারেট বার করলে। 'নে এটা তোর পারিশ্রমিক।'

অমিয় হাসল, বলল, 'অত সস্তা পারিশ্রমিকে চলবে না। পকেটে পয়সা-টয়সা আছে তো চল চা খাব।'

ওরা প্রায় সমবয়সি। তবে গড়ন-গাড়নে অমিয় একটু বলিষ্ঠ। চলনবলনে ওর বেশ একটা চাপা সংযত দৃঢ়তার ছাপ। কাপড়টা মাল-কোচা করে পরা, ময়লা; টুইলের সার্ট গায়, কনুই পর্যন্ত আস্তিন গোটানো, তাও ময়লা; কিন্তু এই ময়লা সার্টের আবরণ ভেদ করে ওর চওড়া বুক নিজেকে ঘোষণা করছে। নাক ও চিবুক বেশ সরু ও তীক্ষ্ণ, নাকের ওপর কালো ফ্রেমের চশমা, আর চশমার নীচে দুটো চিন্তাশীল চোখ। পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডাল।

কিন্তু চায়ের দোকানে বসে কারো মুখে কথা আসছিল না। চা ও সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের আবহাওয়া মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মন যেন ওদের ছড়িয়ে পড়েছে আর কোনখানে, আর কোন কিছুর সংগে মিশে রয়েছে।

কিন্তু কি এই কোন কিছুটা?

কি যে সেটা তা এখন পর্যন্তও অস্পষ্ট। তবে এর সাক্ষাৎ হয়ত নিঃসন্দেহে পাওয়া যাবে শিয়ালদা স্টেশনে, বিস্তৃত পূর্ববাংলার এবং পশ্চিম বাংলার কোণে কোণে। পরস্পরের নিঃশব্দ সান্নিধ্যের মধ্যে বোধ হয় ওরা এই বিরাট কিছুকে অনুভব করছিল মনে মনে, আর দেখছিল পেছনে চোখ প্রসারিত করে।

মনের চিন্তাকে কথার রূপ দিয়ে অমিয় বললে, 'মানুষগুলো যেন কী হয়ে গেছে।' একটু থেমে আবার বললে, 'কাল একটা ঘটনায় মনটা এতো খারাপ হয়ে গেল যে নিজের ওপর ঘৃণা হতে লাগলো।

কল্যাণের চোখে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি।

অমিয় বলতে লাগল, 'কালকে ঢাকা মেল যখন আসে তখন আমি স্টেশনে ছিলাম। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কারা কারা বেরুচ্ছে দেখছি হঠাৎ সতেরো আঠারো বছরের একটি ছেলেকে দেখে ভারি সন্দেহ হ'লো, একটু শঙ্কিতও হলাম। ওর পাজামা পরনে, সুন্দর ফর্সা চেহারা, চোখে মুখে কেমন যেন একটা ভাব, মুখের ওপর যেন হালকা একটা ছায়া, যেন ভয় পেয়েছে।

'গেটের বাইরে আসতেই জিগ্যেস করলাম, আপনি কোথায় যাবেন? ও চমকে ওঠল, আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমার মনে হলো, সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই, যেন কত দূর থেকে চোখের আলো আসছে। মুখখানা রং হারিয়ে ফেলেছে। কথা হারিয়ে ফেলেছে। আমি ওর গায়ে হাত দিলাম। থর্ থর্ করে সমস্তটা শরীর কাঁপছে। সে কী কাঁপা!

'যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হলো; অর্থাৎ ও মুসলমান। ওর হাবভাব দেখে আরও অনেকে এটা টের পেয়ে গেল। তাছাড়া পাজামা পরনে, বুঝতেই পারিস। কারো কারো হাত নিস্‌পিস্ করতে লাগল। আমি বললাম আসুন আমার সংগে।

'বলতেই যেন হঠাৎ ওর চৈতন্য হ'লো। যেন কেঁদে ওঠল, "আমাকে ছেড়ে দিন ভাই; আপনার পায়ে পড়ি; আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে, আপনার পায়ে পড়ি, আপনার—"

'দেখলাম সাংঘাতিক বিপদ। যেভাবে মানুষগুলো ওর দিকে তাকাচ্ছে যেন গিলে খেয়ে ফেলবে। এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারলে

বাঁচি। বললাম, চলুন আমার সংগে আপনার কোন ভয় নেই। বলে আমাদের সেণ্টারের দিকে এগোতে লাগলাম। কয়েকটা ফাজিল ছোকরা পিছু নিলো। ধমক দিয়ে বললাম তোমরা কি চাও এখানে। একটা কে বলল, শালা মুসলমান।

'জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলাম পার্ক ষ্ট্রীটে ওর দাদা থাকে, ভীষণ অসুখ, দেখতে এসেছে। প্রবোধ দিলাম অনেক, কিন্তু মন কি তা মানে? তারপর ভীড় কমে গেলে আমাদের জোয়ান জোয়ান চারজন ভলাণ্টিয়ার সংগে দিয়ে বাড়ী পাঠালাম। যাওয়ার সময় কী করুণভাবে চাইলো আমার দিকে, হাত চেপে ধরে বারবার সেলাম জানাল।

'ওঃ, ওর শরীরের কাঁপুনি যেন আমার হাতে লেগে আছে এখনো। মনটা ভীষণ খারাপ লাগলো।'

বলে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের অবশেষটুকুতে চুমুক দিলে অমিয়। কল্যাণ একটা সিগারেট নিলো, অমিয়কে একটা দিলো, তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'প্রথম প্রথম মনে হতো আমাদের জীবন বা আমাদের দেশটা কী। এখানে কিছু ঘটে না। আর গত তিনচার বছরে কি ঘটে গেল, যা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি।'

কল্যাণ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। ওর মনে হয়, সময় বোধ হয় চলতে চলতে মাঝে মাঝে থেমে যায়। সময়ের এই থেমে যাওয়া অবস্থাটাই বোধ হয় আমাদের জীবনে দুঃসময় বলে পরিচিত। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় বুঝি বা এমনিভাবে সময় থেমে গিয়েছিল। আর ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীই বা কেন। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসেই বোধ হয় ভারতবর্ষে সময়ের চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এই ক'বছরের মধ্যে সে পুনরায় চলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু চলতে পারেনি। সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় মানুষের পক্ষে অতি অল্পকালের

মধ্যে বহু সহস্র বছরের অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই অতীতের আদিমতা আহরণ করে একালের ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি যে আচরণ করেছে, যে হিংস্রতা দিয়ে পরস্পরকে জেনেছে তাই সমবেত ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা নামে লেখা থাকবে। সে লেখাটা মুছে ফেলতে পারলে সে খুসী হতো। কিন্তু সে তো অসম্ভব।

আচ্ছা, সময়কে কি চালানো যায় না ?

কল্যাণের চিন্তাধারা এইখানে এসে শেষ হলো, পুরনো কথার জের টেনে বলল, 'কী বোকা ঐ মুসলমান ছেলেটা।'

কিন্তু অমিয় তাড়া দিলো, 'নে নে ওঠ, আমার আর সময় নেই; শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ফিরতে হবে। ছেলেগুলোব ওপর ভীষণ চাপ পড়ে গেছে। ওঃ খুব পরিশ্রম করছে বে। খুব।—তা তুই কোথায় ?'

'আমি আবার স্টেশনে যাব। দু' একটা ট্রেণ দেখে যাব।'

চায়ের দোকান থেকে স্টেশনে পথ ধরল কল্যাণ। যেতে যেতে মনে পড়লো অমিয়র কথা, ওর শরীরের কাঁপুনিটা এখনো লেগে আছে আমার হাতে।

দুই

সময়কে চালু করার জন্য যাঁরা যুদ্ধের কথা ভেবেছিলেন অথবা যারা মনে করেছিলেন তাঁরা চান বা না চান যুদ্ধ অনিবার্য, তাদের কিন্তু পরিণামে হতাশ হ'তে হলো। যুদ্ধ হলো না, জেনারেল কারিয়াপ্পার গোপন বৈঠকাদি সত্ত্বেও না, জহরলাল নেহরুর অন্যপন্থা অবলম্বনের ঘোষণা সত্ত্বেও না। কলকাতা থেকে দিল্লী ফিরে যাওয়ার পর নেহরুর মন যেন হাওয়া বদলালো, আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোৎসাহী মানুষের মনও দমে গেল। নেহরু পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দিলেন, তা কলকাতার বিবৃতির সঙ্গে মিললো না; লোকে বলাবলি করতে লাগলো, লেডি মাউণ্টব্যাটেন এসে ওঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে; কেহ বললো, প্যাটেল থুথু ফেলে থুথু খেলো।

আসল কথা যুদ্ধ হলো না। নেহরু গুণ্ডাদের শাসালেন, জনসাধারণের নিকট সহযোগিতার আবেদন করলেন, শান্তি শান্তি ব'লে চেঁচামেচি করতে লাগলেন আর কাঁচা-মিঠে সুরে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলা স্থাপনের অনুরোধ করলেন।

অপর দিকে ভারতবর্ষের আবহাওয়া যখন খুবই উষ্ণ, যুদ্ধ কখন বাঁধে তার আশঙ্কায় সকলে উদগ্রীব, তখন রকমসকম সুবিধের নয় মনে করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদেরও টনক নড়ে। করাচী থেকে কড়া হুকুম এলো ঢাকায় দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য, উভয় গভর্ণমেণ্টের পারস্পরিক সহযোগিতায় উভয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং উদ্বাস্তু গমনাগমনের সমস্যা ইত্যাদি। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য এবং পণ্ডিত নেহরুর মনের হাওয়া যখন একই খাতে বইতে লাগলো, তখন আর কোন বাধাই রইলো না।

সাক্ষাৎকার হলো দিল্লীতে।

প্রসব হ'লো নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি।

রাষ্ট্রনায়কদ্বয়ের মনের কোণে কি কথা গোপন ছিল সংবাদপত্রে তার কোন প্রকাশ নেই। চুক্তি সম্পর্কে কাগজে যা প্রকাশিত হ'লো তাতে সর্বসাধারণ জানতে পেল যে, ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে শান্তিতে চিরকাল বসবাস করতে পারে সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্ট সেরূপ ব্যবস্থা ও আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন, এবং তা অক্ষুণ্ণ রাখবেন। আর যারা বাস্তত্যাগ করতে ইচ্ছুক তারা যাতে নির্বিঘ্নে সীমানা অতিক্রম করতে পারে, তার ব্যবস্থাও চুক্তিতে করা হলো; পথে ঘাটে যে অত্যাচার, অকারণ হয়রাণী ও অসম্মাননা চলছিল, উভয় রাষ্ট্রের সীমানাতেই তেমন কিছু হবে না, এ আশ্বাস দেওয়া হলো।

চুক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তান যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যে সব পাকিস্তানী সংবাদপত্র ভারতবর্ষ ও ভারতীয় রাষ্ট্রকর্ণধারদের বিরুদ্ধে নির্ভেজাল বিষোদ্গার করছিল, তারা অকস্মাৎ সেই সব নেতাদের সম্পর্কেই অসম্ভব রকমের সাধুবাদ দিতে লাগলো। খেয়াল নেই যে এই সাধুবাদের বংএ আসল চেহারাটাই বিকৃত হয়ে যেতে পারে। ভারতের সংবাদপত্র-গুলো কিন্তু সুর বেশী পাল্টালো না। তথাপি সবাই বুঝে নিলো যে যুদ্ধ হ'লো না।

আরও একটা জিনিষ হলো না। অর্থাৎ নেতাদের আশা সফল হলো না। যাঁরা আশা করেছিলেন, সংখ্যালঘুরা চুক্তির পর আর সীমানা পার হতে চাইবে না, তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁদের আশা, ইতিহাস-বোধ এবং বাস্তব জ্ঞানকে উপহাস করে হাজার হাজার লোক ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্তে পাড়ি জমাচ্ছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন যুদ্ধ হবে না এই আশ্বাসে, আর পাকিস্তানের হিন্দুরা স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললো নিরাপদে সীমানা পার হতে পারার আশ্বাসে। তাই, যারা পথেঘাটের অত্যাচার লাঞ্ছনার ভয়ে বাড়ীর বাইরে পা ফেলতে ভয় পাচ্ছিল, তারাও এবার নিরাপত্তার আশ্বাসে ধীরে সুস্থে মোটঘাট বাঁধতে লাগলো। দিল্লীর সবকারী ভবনের প্রাসাদ চূড়ায় দাঁড়িয়ে পণ্ডিত নেহরু ভাবলেন, আমি তো এটা চাইনি, আমার থিয়োরী তো একথা বলে না। তবে এ কেমন হ'লো ?

সত্যি এ কেমন হ'লো।

এমনি করেই লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যলিপি রচিত হয়, পরিবর্তিত হয়। কয়েকজন লোকের ইচ্ছা ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষেব জীবনও দ্বিখণ্ডিত হলো। তাঁদেবই অচেতন ইংগিতে এদেব ভাঙ্গা জীবন পবস্পবেব রক্তে স্নান করলো, কিন্তু পূর্ণ হলো না পবিত্র হলো না। আবাব তাঁদেরই অঙ্গুলি নির্দেশে এরা যাত্রা কবলো অনিশ্চিতের উদ্দেশে।

এরা জানে সেটা জীবন না হয়ে মৃত্যুও হতে পাবে।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনে প্রকাশ্য বৈঠকখানার পাশে আরেকটি প্রাইভেট বৈঠকখানা। বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, পারিষদ বা বন্ধুদের সংগে সেখানে বসে তিনি কথা বলেন। বেশ সুসজ্জিত ঘরটি। মেঝেতে কার্পেট, সুন্দব দামী ক্যাবিনেট টেবিল এবং টেবিলের চারধারে দশটি গদী-আঁটা চেয়ার। টেবিলে কাঁচ বসানো। দেয়ালে গান্ধী, নেহরু, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও স্বয়ং ঘোষ মহাশয়েব প্রতিকৃতি।

তার পাশেই প্রকাশ্য বৈঠকখানাটি সাজসজ্জায় দরিদ্র। এখানে সমস্ত ইতরজনের প্রবেশাধিকার। পাশেই দর্শনপ্রার্থী আগন্তুকদের বসবার বড়

হলঘর, সাধারণ পরিপাটিহীন। সেখানে আজও বেশ কিছু লোক ভীড় জমিয়ে আছে, যদিও শ্রীযুক্ত ঘোষের সেক্রেটারী তাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে ঘোষ মহাশয় আজ কিছুতেই কারো সংগে দেখাসাক্ষাৎ করবেন না। তাঁর সময়ের একান্ত অভাব।

তবে রাস্তায় একটি অপেক্ষমান পুরানো ধরণের গাড়ী দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত কোন অতিথি এসে থাকবেন।

সত্যি তাই। মাননীয় অতিথিটি কংগ্রেস নেতা ও কর্মী ডাঃ শচীশ সেন। প্রাইভেট বৈঠকখানায় ইতিমধ্যেই তিনি শ্রীযুক্ত ঘোষের সংগে গল্প করছেন। দেখতে শুনতে প্রবীণ। মাথার সামনেটায় বেশ টাক পড়েছে; পাতলা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও ধুতি পরনে। দৃষ্টিশক্তি এখনো বেশ প্রখর, তাই নাকে চশমা নেই, নাকটা যদিও ভোঁতা।

আর সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের চেহারা তো সর্বসাধারণে সুবিদিত। কেননা, সংবাদপত্রে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়, বিভিন্ন ভংগীতে।

ডাঃ সেন বলছিলেন, 'আমার কিন্তু মনে হয় এতটা এগিয়ে আমাদের পক্ষে পিছু হটাটা ঠিক হয়নি।'

গোল্ড ফ্লেকের টিন থেকে সিগারেট নিয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষ বললেন, 'সত্যি তাই। ব্যক্তিগতভাবে আমারও তাই মত, একটা এদিক সেদিক হয়ে যাওয়া ভাল। দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে তা সামলানো মুস্কিল।'

'নিজে সমস্ত প্ল্যানট্যান করে প্যাটেলও শেষ পর্যন্ত—'

'হ্যাঁ, প্যাটেলও শেষ পর্যন্ত। আমরা তো সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম, আর আগে থেকেই তো গোপন নির্দ্দেশ আমাদের সব ছিল। তা কি করবে বল, সেণ্টারের ব্যাপার আমাদের তো কোন হাত নেই।'

'আমার তো সেইটেই আশ্চর্য লাগছে, প্যাটেলের মত লোক শেষ মুহূর্তে বিচলিত হলেন।'

'না হে না, বিচলিত হওয়ার প্রশ্ন নয় বা ব্যক্তিত্বের প্রশ্নও নয়। আসলে ব্যাপারটা হয়ে গেছে অন্য রকম।'

'মানে ?'

'সব কথা তো আমাদের পক্ষেও সঠিক জানার উপায় নেই, তবে খানিকটা অনুমান করছি। কলকাতা থেকে নেহরু দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার পরই আমেরিকান কন্সাল ওঁর সংগে দেখা করেছিলেন লক্ষ্য করেছিলে ? সর্দ্দারজীর সাথেও করেছিলেন। আমার মনে হয়, এর একটি গভীর অর্থ আছে। আমেরিকা হয়ত চায় না এই সময়ে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে একটা যুদ্ধবিগ্রহ হোক।'

'বলেন কি ?'

'আর তা ছাড়া লেডি মাউণ্টব্যাটেন একেবারে ব্যক্তিগত কারণেই দিল্লী এসেছিলেন তা-ও তো নয়। কাজেই নানাদিকে বিবেচনা করে প্যাটেলকেও মত পাল্টাতে হলো।'

'কিন্তু,—যদিও আমরা একথা কোনদিন প্রকাশ্যে স্বীকার করিনি, ইংলণ্ড-আমেরিকা পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিরোধ জিইয়ে রাখতে চায়, এটাই তো ওদের কাজকর্ম থেকে বুঝে এসেছি।'

'ঠিকই বুঝেছিলাম আমরা। তবে অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা বদলায় তো বুঝতেই পারো। সারা এশিয়া যে লাল হতে চললো!'

'ওঃ আসল কারণ তাহলে ওখানে।'

'হ্যাঁ, আসল কারণটা ওখানে।...তা দেখো, ওদিকটা তো আমরা কখনো ভেবে দেখিনি। এ সময়টা একটা গোলযোগ হলে তো ঐ ব্যাটাছেলেদেরই সুবিধে হবে!'

ডাঃ সেন একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'দেখুন পঞ্চাননদা, এ জিনিসটাও আমার ভাল লাগে না।

'কি বলো তো ?'

'এই কথায় কথায় আমেরিকার হুকুম মেনে চলা। কোন কাজেই যদি সাহস করে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত না নেওয়া যায় তো কোথায় স্বাধীন হলাম বুঝতে পারা যায় না।'

শ্রীযুক্ত ঘোষ হাসলেন ও সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, 'ব্যাপার বড ঘোরালো হে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' ডাঃ সেনের স্বরটা মনে হলো উত্তেজিত।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটার পর ঘোষ মহাশয় বললেন, 'আমি ভাবছি কি জানো কোনদিন না অউঙসানের মত মরতে হয় আমাদের।'

'বটেই তো। মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে পেছন থেকে ল্যাজ ধরে টানা, এ কি রকম কথা ?'

ঘোষ মহাশয় বললেন, 'সে যা-ই হোক, বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি রকম হবে।'

'কদিন বাদেই বুঝতে পারবেন'খন ব্যাপারটা কি হ'বে। তখন কে সামলাতে আসবে শুনি ? নেহরু আসবে না প্যাটেল আসবে ?…… পাকিস্তানী গুণ্ডাদের উপর আমার এক কণা বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস কারই বা আছে বলো।'

'তবু তো এর একটা মীমাংসা আপনারা করলেন না।'

খানসামা দু'প্লেট খাবার ও চা দিয়ে গেল। বাইরে মোটর থামার শব্দ হলো, এবং একটু বাদেই ঘোষ মহাশয়ের সেক্রেটারি ঘোষণা করলো, মূলচাঁদ আগরওয়ালা এসেছেন।

'নিয়ে এসো এখানে।' ঘোষ মহাশয় বললেন।

ঘরে ঢুকেই খাবার টাবার দেখে মূলচাঁদ বললেন, 'একটু অসুবিধে করলাম নাকি স্যার ?'

আসুন, আসুন ;—তা তো বটেই। শাস্তিও পাবেন একটু বাদেই।

থপ্ করে একটা চেয়ারে বসলেন মূলচাঁদ আগরওয়ালা। বেশ কালো মোটাসোটা চেহারা। ফিনফিনে ধুতি ও পাঞ্জাবি পরণে। পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জিটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেন সব ক'টা সুতোই গুণতে পারা যায়। গায়ে উগ্র সেন্টের গন্ধ। চোখ দুটো মিটমিটে, দাড়ি গোঁফ কামানো, পাতলা চুল মাথায়। সহরতলীর অনেকগুলো বস্তি ও জমিব মালিক, ব্যবসাদাব।

বসেই মূলচাঁদবাবু ডাঃ সেনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি তো সে দিনের পার্টিতে যাননি দাদা। সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করলো, বলাবলি করলো শচীশ এলো না শচীশ এলো না।'

'হুঁঃ যেতে পারিনি। বোঝেনই তো সব দিক সামলে চলতে হয়। গিয়েছিলাম শিয়ালদায়, আটকে পড়লাম আব শেষে যাওয়ার মত মনও ছিল না।'

'সেজন্যে তো আমি সে পথ মাডাই-ই না। চোখে দেখলে মনটা এত খারাপ হয়ে যায় কি বলবো।'

ডাঃ সেন ঘোষ মহাশয়ের পানে তাকালেন।

ঘোষ মহাশয় মৃদু হেসে বললেন, 'তারপর মূলচাঁদ বাবু খবরটা বলুন।'

'আমি তো আপনার কাছে শুনতে এলুম স্যার।'

মূলচাঁদবাবু অকাবণে হাসলেন। ডাঃ সেন এবং ঘোষ মহাশয়ও কিছু বললেন না, অথবা বলতে পারলেন না। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা তালভাঙ্গা আবহাওয়া। আরেকটা সিগারেট ধরালেন ডাঃ সেন।

খানসামা আরেক প্লেট খাবার ও চা রেখে গেল। মূলচাঁদ খাবারে হাত দিলেন। পুনরায় সেক্রেটারি দর্শন দিয়ে বললে, 'সুজাতাদি ফোন করেছিলেন, আপনি বাড়ী আছেন কিনা জিগ্যেস করলেন। আমি বলে দিলুম, আছেন।'

ঘোষ মহাশয় আনন্দিত হ'লেন মনে হ'লো। জিগ্যেস করলেন, 'ও আসবে বললো নাকি?'

'এখ্খুনি এসে পড়বেন বললেন।' সেক্রেটারি বাইরে গেল।

মূলচাঁদবাবু চা-এ চুমুক দিচ্ছেন। ডাঃ সেন অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছেন, আর শ্রীযুক্ত ঘোষ খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। তিনটি লোক চুপচাপ বসে। সাধারণ সমাজবিন্যাস, সরকারী নীতি এবং বিভিন্ন সুযোগ ও সাহচর্যের মাধ্যমে যদিও এঁদের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, এক-ই সূত্রে সংগ্রথিত হয়ে গিয়েছে, তথাপি যেন ডাঃ সেন ও ঘোষ মহাশয় মূলচাঁদকে কোন দিনই সহৃদয়তার সংগে গ্রহণ করতে পারেন না। বিশেষ করে ডাঃ সেন। মূলচাঁদ এমন একটা সংস্কার-সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের ঐতিহ্য ঘোষণা করেন, যা ওঁর মনে হয় কদর্য, কুৎসিত। তাই ওঁর ঠোঁটের কোণে বক্র ইংগিত, চোখে ব্যঙ্গ, আর মূলচাঁদের প্রতি আচরণে একটা সযত্ন উপেক্ষা।

একটা অস্বস্তির মেঘ যেন সঞ্চিত হলো। ঘোষ মহাশয় মনে মনে কামনা করিতে লাগলেন সুজাতার আগমনের, কেউ একজন না এলে যেন মেঘ কাটবে না।

কিন্তু সুজাতা তৎক্ষণাৎ-ই এলো না। এলেন শ্রীযুক্ত ত্রিদিব রায়, কলকাতার কলেজের অধ্যাপক। তিনি কখনও তাঁর আগমন-ঘোষণার অপেক্ষা করেন না। তাঁর যাতায়াত অবাধ, অস্থির, অজিজ্ঞাসিত। আরে, শচীশদা এখানে। বাঃ মূলচাঁদবাবুও যে! নমস্কার, নমস্কার, বলে শ্রীযুক্ত

রায় একটা চেয়ারে বসলেন। বেশ মাংসল চেহারা; দৈর্ঘ ও প্রস্থ দুদিকেই রীতিমতো প্রশস্ত। মুখেব গডন একটু লম্বা ধবণের, কিন্তু মাংসেব পরিমাণ একটু বেশী হওয়ায় চোখে মুখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে কি নেই কিছু বোঝা যায় না। ববং অন্যান্য দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও কোথায় যেন একটা সামগ্রিক শ্রীর অভাব। তাই মনে দাগ কাটে না সহজে, যদিও পবিষ্কাব মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমেব চশমা এবং সাদা ধব্ধবে কাপডজামা পরনে। বয়েস চল্লিশেব এদিক ওদিক। চেয়ারে বসতে বসতে তিনি অভিযোগের সুবে ঘোষমহাশয়কে বললেন, 'বলে দিলুম পঞ্চাননদা, এ যা হচ্ছে তা মোটেই ভাল হচ্ছে না দেখে নেবেন।'

'কি, ভাই, কি।'.

'এতো তোডজোড হৈ-হল্লা করে শেষে কিনা দিল্লী প্যাক্ট। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।'

ঘোষ মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীযুত বায়ই বলতে লাগলেন, 'যেদিন পাকিস্তান এসে কলকাতায় চাঁদ-তাবা ওডাবে সেদিনও বোধ হয় অপনাদের ঘুম ভাঙ্বে না।'

এবার ঘোষমহাশয় কথা বললেন। বললেন, 'বাষ্ট্রপতির ষ্টেট্মেণ্ট পড়েছো, আব শঙ্কর রাও দেও-এর?'

'পড়েছি। যত সব foolish কথাবার্তা। বলি, একটা unreal reality, একটা অবাস্তব বাস্তবকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হ'বে? পাকিস্তান স্বীকার করেছি মানলুম, কিন্তু, স্বীকার করেছি বিশেষ কতগুলো অবস্থায় ও আশায়। পাকিস্তান সে আশা পূরণ করেছে, না সে অবস্থা এখন আছে? কাজেই পুরনো কথা আজ বলে লাভ কি? যত সব ইয়ে—'

শ্রীযুক্ত বায়ের গলাব আওয়াজে ঘবটা যেন কাঁপে। এবার মূলচাঁদ আগবওয়ালাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ও ভাল কথা, মিসেস রায় আপনাব খুব সুখ্যাতি করেছেন।'

'হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—' মূলচাঁদ হাসলেন।

ডাঃ সেন তীব্র কটাক্ষে রায়ের দিকে তাকালেন।

রায় বলে চলেন, 'আপনি মিসেস রায়কে যে শাড়ীখানা পাঠিয়েছেন, তা নাকি ওকে খুব মানিয়েছে। আপনার রুচির কী প্রশংসা! তা আমি বললাম, এবার তাহলে আমি বিদেয় হই, মূলচাঁদবাবুই আমার জায়গায় বহাল হোন।' বলে হাসলেন।

'হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—কি যে বলেন স্যার!' মূলচাঁদবাবু হাসেন, কিন্তু সে হাসিতে লাজলজ্জা সংকোচ কোন কিছুই প্রকাশ পেল না। ঘোষ মহাশয়ও সজোরে হাসলেন। ডাঃ সেন শুধু পুনরায় রায়ের দিকে তাকালেন।

শ্রীযুক্ত রায় পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, 'এদিকে শ্যামাপ্রসাদ তো পদত্যাগ করেছেন। এবার বিবৃতির জ্বালায় আকাশে আগুন ধরবে।'

ডাঃ সেনের মনটা বোধ হয় এর মধ্যেই একটু তিক্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'এটা কি খুব হাসি-মসকড়ার সংবাদ হ'লো নাকি ত্রিদিব?'

'আমি কি তাই বললুম? শ্যামাপ্রসাদ কি role play করে that has got to be watched.'

'হ্যাঁ ঠিকই তাই। ডাঃ মুখার্জির অসাধারণ ক্ষমতা আছে সেটা তোমরা স্বীকার করো না কেন?'

'সে তো স্যার ঠিক কথা।' বক্তা মূলচাঁদ।

'অস্বীকার করলুম কখন? স্বীকার করি বলেই তো বলছি শ্যামাপ্রসাদ যে আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন তা ঠাণ্ডা করতে হলে গভর্ণমেন্টকে অনেক তেলনুন খরচ করতে হবে।'

ঘোষ মহাশয় বললেন, 'আমাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু এমনিতে তাঁকে ঠেকাতে পারে বাংলাদেশে এমন কেউ আছে বলে দেখছি নে।'

'মিনিষ্ট্রীতে ঢোকাতে পারেন কিনা দেখুন।' রায়ের সুপারিশ।

সকলেই হাসেন, কিন্তু সে হাসি নির্জীব।

'সত্যি ভাববার কথা।' ঘোষ মহাশয় বলেন।

'কি অমন ছাই ভাববার কথা। জহরলালকে কলকাতায় নিয়ে আসুন না, একটা বিবৃতি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের দেশের mass তো, স্রেফ ভেড়ার পাল, যা বোঝাবেন তাই বুঝবে।' শ্রীযুক্ত রায় উৎসাহের সঙ্গে বললেন।

মূলচাঁদ হেঁ হেঁ করে হাসলেন।

কিন্তু এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেননি যে মূলচাঁদবাবু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁর ডান হাতখানা বেশ সযত্নে টেবিলের উপর রেখেছেন। ঘোষ মহাশয়ের দৃষ্টিই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হ'লো। একটু বিস্মিত হয়েই বললেন, 'মূলচাঁদবাবু, এ আংটিটা তো এর আগে আপনার আঙুলে দেখিনি।'

'হ্যাঁ স্যার ওটা নতুন; আমার দাদা দিল্লী থেকে এনেছেন।' বলে হিরে-বসানো আংটিটা খুলে দিলেন। ঘোষ মহাশয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই আঙুলে পরলেন। কিন্তু একটু বাদে খুলবার উদ্যোগ করতেই মূলচাঁদ করজোড়ে বললেন, 'স্যার, ওটা ও আঙুলেই মানিয়েছে ভাল, দয়া করে খুলবেন না স্যার!'

'বলেন কি? না না সে কি।'

'না স্যার ; আমি ব্যবসায়ী লোক, আমার হাতে এটা শোভা পায় না। ওটা ওখানেই থাক।' বেশ বিনয়-গদগদ কণ্ঠস্বর মূলচাঁদের। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৃতজ্ঞতায় বোধ করি ঘোষ মহাশয় কথা বলতে পারলেন না। আংটিটা আঙুলেই থেকে গেল। অধ্যাপক রায় বললেন, 'মূলচাঁদবাবুর উদার প্রাণ।'

ডাঃ সেন বললেন, 'আপনারাই দেখছি দেশের প্রকৃত মালিক। আমরা কি, গভর্ণমেণ্ট কি!'

শেষের কথাটাকেও তোষামোদ মনে করে মূলচাঁদ হাত কচলাতে কচলাতে হাসতে লাগলেন।

ডাঃ সেন ওঠার উদ্যোগ করলেন। তাঁকে উঠতে দেখেই ঘোষ মহাশয় বললেন, 'উঠলে যে? বসো সুজাতা আসছে যে!'

'তা আসুক। ওর সঙ্গে তো আমার বিশেষ প্রয়োজন নেই।' ডাঃ সেনের গলার স্বরটা যেন কেমন। ঘোষ মহাশয়ের ভাল লাগলো না। বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই ডাঃ সেন নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

সুজাতা মুখার্জির বয়েস পঁয়ত্রিশের ওপর। গড়নটা ও চালচলন একটু ভারিক্কী গোছের। চেহারায় আকর্ষণীয় কিছু নেই, কোনদিন অগ্নিকটাক্ষে সে কাউকে আকর্ষণ করতো কিনা আজ তা বোঝবার উপায় নেই। ফর্সা গোলগাল মুখাবয়ব। অবিবাহিত। পোষাক পরিচ্ছদে মার্জিত আভিজাত্যের ছাপ। ঘরে প্রবেশ করতেই ঘোষ মহাশয় সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'এসো ভাই।'

সুজাতা অধ্যাপক রায়কে দেখে যেন বিস্মিত হ'লো, 'তুমি এখানে?'

'আশ্চর্য্য হচ্ছ নাকি?'

'তা বই কি! ছাত্র না চড়িয়ে মন্ত্রী চড়াতে এসেছ তাতে তো আশ্চর্য হবারই কথা।'

'বটে। তা তুমিই বা কম কিসে? মহিলা সমাজকে উদ্ধার করে এবার কি মন্ত্রীদের উদ্ধার করতে এলে নাকি?'

'দেখি তোমাকেও পারি কি-না।' বলে সুজাতা মুলচাঁদকে নমস্কার করে বললো, 'খুসি হলাম আপনাকে দেখে।'

তারপর ঘোষ মহাশয়কে বললেন, 'আচ্ছা পঞ্চাননদা, আপনাদের ব্যাপারখানা কি বলুন তো, লোকগুলোকে কি এমনিতেই মারবেন স্থির করেছেন?'

'রক্ষে কর রক্ষে কর, আজ যে তোমার দেখছি একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব। ভাই একসংগে সকলকে আঘাত করো না।'

'না, ঠাট্টার কথা নয়; এর মধ্যে গিয়েছেন শিয়ালদায় কখনো?'

'না ভাই সুযোগ বা প্রয়োজন কোনটাই হয়নি।'

অধ্যাপক রায় বললেন, 'আর গেলেই বা কি স্বর্গ উদ্ধাব হ'তো। ওঃ যেন রাবণের গোষ্ঠী, আসছে তো আসছেই; আর ফুরোয় না।'

'আচ্ছা রায়, তোমার কি মনুষ্যত্ব বলে কোন কিছু নেই?'

'দেখো কথাটা বড শক্ত বলে ফেলেছো। তোমারই বা কি আছে তা যদি বলি তো ঠিক জবাব দেওয়া হয়। কিন্তু যাক সে প্রসঙ্গ। কথা হলো যারা বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে আসছে, তাদেরকে আমি রক্ষা কবতে পারবো না গভর্ণমেণ্টও যে বিশেষ কিছু করতে পারবেন সে ভরসা আমি করি না। আমি যেমন দুচার পয়সা দক্ষিণা দিতে পারবো তেমনি গভর্ণমেণ্টও মুষ্টিভিক্ষে দিতে পারবেন। তাতে কি মানুষ বাঁচবে? না কোনমতেই না। তা'হলে ওদের যদি না বাঁচাতে পারি তো তার মানে কি এই যে আমরা মরে যাবো? সবাই একসংগে মরার চেয়ে কিছু লোক বাঁচা ভাল। তাই আমরা যারা বেঁচে আছি তারাই বাঁচবো। তোমার মরতে সাধ যায়, মরো না গিয়ে।'

'আমি তোমার advice চাইনে রায়।'

'কিন্তু advice দিতে তো এসেছ।'

'তোমাকে নয়।' ক্রোধে সুজাতার ঠোঁট কাঁপছে যেন।

কোন অজ্ঞাত কারণে এঁরা পরস্পরকে আজ এই মারমুখো দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জানছে, তা ঘোষ মহাশয় বহু কষ্টেও অনুমান করতে পারছেন না। কিন্তু বুঝতে পারছেন একটা গভীর রহস্য রয়েছে এর পশ্চাতে। যেটা আজকের কলহের মতোই হবে কৌতূহলোদ্দীপক। দু'জনকেই বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি ; কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি কারো মুখশ্রী মলিন করেনি দেখতে পেলেন। এঁদের দৃষ্টি বিনিময়ও হলো, কিন্তু কেউ স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে পারলো না। কত শঙ্কা সংকোচ, কত ঘৃণা, কত প্রীতি, কত ঈর্ষা ও কত ভালবাসা দিয়ে যেন এঁরা একে অন্যকে দেখতে চাইছেন, বুঝতে চাইছেন।

ঘোষ মহাশয় পরিস্থিতিটাকে মোলায়েম করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'না ত্রিদিব কথাটা তা নয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের যার যা দেওয়ার আছে আমরা তাই দেব, যে যতটুকু করতে পারি আমরা তাই করবো, নইলে আমরাই কি বাঁচতে পারবো বলে মনে করো? আমার তো মনে হয় আমরা যাদের মারবো, তারাই আমাদের মারবে।'

'ঠিক কথা স্যার। সেজন্যই তো রিফিউজিরা জোর করে আমার জায়গা দখল করে বাড়ী ঘর করা সত্ত্বেও আমি কিচ্ছু বলছি না। আহা-হা বেচারার দল, সবই তো গিয়েছে।'

অধ্যাপক রায় কোন কথা বললেন না।

ঘোষ মহাশয় বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের মনটাকে আজ সেইখানে বাঁধতে হবে।..তা ভাই সুজাতা তোমরা কি প্রোগ্রাম করেছ?'

'সে আপনাকে অন্য সময় জানাব।' বলে সুজাতা কঠোর দৃষ্টিতে অধ্যাপক রায়ের দিকে তাকালো। রায় নীরব নিশ্চুপ। সকলেই বুঝে নিলেন এই আবহাওয়ায় আর কোন আলোচনা হতে পারে না। তাই যে কোন ছুতো করে ওঠে পড়াই শ্রেয়। মূলচাঁদ বাবু প্রথমে ওঠলেন, তারপর অধ্যাপক রায়।

তিন

শিয়ালদা স্টেশনে দিন সাতেক অন্নহীন নিদ্রাহীন অবস্থায় পড়ে থেকে জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে কমলার। হয়তো কথাটা ঠিক হলো না; কেন না, বাড়ী ছাড়ার পর সে যে পর্বে পা দিয়েছে, তাকে জীবন বলা যায় কিনা, তাতে গভীর সন্দেহ আছে ওর। এই জীবন-নয় জিনিসটার প্রতিই ওর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। এই জীবন-নয় অবস্থায় গা ঘিন্ ঘিন্ করে, বমি আসতে চায়। যে কোন মুহূর্তেই দম আটকে যেতে পারে মনে হয়। অথচ এ অবস্থাটাকেই আকড়ে ধরে পড়ে আছে শত শত লোক, শত শত কেন হাজার হাজার লোক। চোখের সামনেই সে দেখতে পায় কী, কদর্য দেখায় এই জীবন-নয় অবস্থাটাকে। ঘৃণায় আৎকে ওঠে ওর মন। সম্ভবত সে নিজেও তেমনি কদর্য হয়ে গেছে, আর তাকে দেখেও হয়তো আঁৎকে ওঠে শত শত লোক। সে ভাবে।

কিন্তু কি চেয়েছে ওরা, কি চায় সে?

একটুখানি আশ্রয়। কে দেবে আশ্রয়? ওর বাবা মা ভাই ওরই পাশে বসে কদর্য জীবনযাপন করছে, নিতান্ত অসহায় অশক্ত। সে বুঝে নিয়েছে এই জীবন-নয় সমুদ্রে নোঙর করার ক্ষমতা ওদের নেই। তাই তাদের কোন ভরসা সে করে না, করা ছেড়ে দিয়েছে। বাইরের বহু লোকের গমনাগমন এখানে; বহু সেবা-সমিতি আর্ত-সেবায় নিয়োজিত। সেবা সমিতির সংস্পর্শহীন বহু লোকও এখানে আসে, মন-জুড়ানো দুটো কথা বলে, সান্ত্বনা দেয়, আশ্বাস দেয়, মাঝে মধ্যে জামাটা কাপড়টা দিয়ে যায়। কিন্তু এদের ক্ষমতাই বা কতটুকু তা সে জানে না। তাই জানে না কতটুকুই বা এদের কাছে সে প্রত্যাশা করবে। অথচ কারো ওপর নির্ভর না করলে যে আর নয়, কারো কাছ থেকে একান্তভাবে কিছু

প্রত্যাশা না করলে যে আর নয়। তার আশ্রয় চাই, অবলম্বন চাই ঘর-বাঁধা চাই। এই জীবন-নয় অবস্থা থেকে যে তার মুক্তি চাই। মনে মনে সে খুঁজে বেড়ায় কার কাছে সে প্রত্যাশা করবে; কিন্তু কোন সন্ধান সে পায় না।

এমনি অবস্থায় মন তার বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'তে থাকে। বিভিন্ন অসংলগ্ন ধারায় তার চিন্তা অগ্রসর হ'তে থাকে। মনের গতির ওপর ওর আর কোন নিয়ন্ত্রণ যেন খাটছে না। কিন্তু, তবুও এই চিন্তাব প্রবাহের মধ্যেও এমন একটা স্তর আসে যখন সে থমকে দাঁড়ায়, ভাবে; আর অগ্রসব হতে চায় না। গায়ে কাঁটা দেয়।

শুভার্থী দরদীদের মধ্যে এমন অনেকে আসে যাদের চলনবলন ওর ভাল লাগে না। যেন অকারণে কথা বলে, অকারণে চেয়ে থাকে। এদেরকে বিশেষ কাজ করতেও সে দেখে না, বিশেষ সহায়তাও না। যেন কথার সামগ্রী নিয়েই এরা আসে। কমলা বিরক্ত হয়। অথচ সে নিজে জানে যে, সে সুন্দরী নয়। নাক-চোখেব জৌলস তার নেই, বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবও তার কিছু নেই; উপরন্তু গায়ের রংও তার ফর্সা নয়। হয়তো বা ছিল স্বাস্থ্য; কিন্তু তাও তো একটানা অর্ধাহার অনাহার ও জীবন-নয় অবস্থার অত্যাচারে শুকিয়ে গিয়েছে। লোভাতুব পুরুষদের দৃষ্টি তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, এটা তার ধারণারই বাইরে। তবু এদের কথা বলার ও চলার ভংগী ওর ভাল লাগে না। রীতিমত বিরক্ত হয় সে। কিন্তু সে আশ্রয়হীন, তাই এগুলোকেও সে জীবন-নয় অবস্থার অবিচ্ছিন্ন অংগ বলে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু জীবন-নয় অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

কমলা ভাবে। আচ্ছা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না সে? কিন্তু সে পথও যে বন্ধ। বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা নেই তার, সামান্য সূচী-কর্ম ছাড়া

আর বিশেষ কোন বিদ্যাও জানা নেই। এই সামান্য পুঁজিতে সে দাঁড়াতে পারবে কেন? সহৃদয় বিবেচনার দাবীই বা করবে সে কোন যুক্তিতে। চাকুরী? সে তো কল্পনাতীত। তাহ'লে?

হতাশা ও দুঃখে মন ভেঙ্গে যায় ওর। চোখ ভরে কান্না আসতে চায়। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে। কাতর হয়ে ডাকে ভগবানকে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মন সন্দেহে ভরে যায়। এতো বড় দৈন্য দুর্দ্দশা ও হতভাগ্য ক্ষয়ের চিত্র দেখেও আপনাতে যার মন গলে না, ডেকে কি তার করুণার উদ্রেক করা যাবে? লক্ষ কণ্ঠের ডাক যার কানে পৌঁছল না, ওর একলার ডাক তার কানে পৌঁছাবে? তবু সে ডাকে। মনটাকে স্থির করে একাগ্রভাবে প্রার্থনা করার চেষ্টা করে সে।

কিন্তু নিমেষে এই চিন্তা মিলিয়ে যায়।

ছোট ভাইটাকে কোলে নিয়ে ওর মা ঘুমে ঢুলছে! ময়লা কাঁথার বিছানায় বড় ভাইটা কুকুরের মত ঘুমুচ্ছে। বাক্সে মাথা রেখে মাটিতে পা ছড়িয়ে ওর বাবা চোখ বুজে পড়ে আছে। চিন্তায় ছটফট করছে ও নিজে। কাউকে ভাল লাগছে না। মা, বাবা ও ভাইদের প্রতি ঘৃণায় ওর বুক যেন ভরে ওঠে। মরণ হয় না ওদের, মরণ হয় না ওর নিজের?

শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। মন ওব অবলম্বনের আশায় দিক-ভ্রান্ত হয়ে বিচিত্র পথে ঘোরে।

পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটির কেন্দ্রীয় অফিসে বসে অমিয় দাস একটা হিসেব মিলাচ্ছিল, তার সামনে টেবিলে দু'তিনটে টাকা ও

খুচরো কিছু আনি দু'য়ানি সিকি। আজ অফিসে ভিড় নেই, একটি ছেলে অমিয়র হিসেব মিলানোয় সাহায্য করছিল, একটি মেয়ে টাইপ করছিল দ্রুত আঙুল চালিয়ে, আর ঘরের বাইরে বারান্দায় লম্বা একটা টুলে কয়েকটি ছেলে মুড়ি চিবোচ্ছিল। কোন কোলাহল নেই, শুধু টাইপের খট্ খট্ শব্দ ছাড়া।

মাথা নীচু করে অঙ্ক যোগ দিতে দিতে অমিয় শুনতে পেল কাদের পায়ের শব্দ তারই টেবিলের কাছে এসে থেমেছে, এবং তাদের একজন সম্ভবত তাকেই সম্বোধন করে বললো, 'দেখুন ?'

মাথা না তুলেই অমিয় বললো, 'এক মিনিট। বসুন।'

যোগ শেষ করে মাথা তুলে জিগ্যেস করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

আগন্তুকদের একজন বললেন, 'দেখুন, আপনাদের যেমন সময়ের বিশেষ অভাব, তেমন আমাদেরও আছে; আর আরেকটা জিনিষের অভাব আমাদের আছে সেটা হ'লো পয়সার—রোজ রোজ আমরা আসতে পারি না।'

কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ও তেজে অমিয় চমকিত হ'লো। কেন না রিলিফ অফিসে যারা আসে, সাহায্য প্রার্থনা করেই তারা আসে। কথার সুর তাদের নরম, ভেজা। কিন্তু এর সুরটা উগ্র, যেন কাতরভাবে কিছু চাইতে আসে নি, জোর করে আদায় করতে এসেছে, যদিও অমিয় জানে না কি জিনিষ এরা আদায় করবে। পলকে এদের সকলের উপর চোখ ফিরিয়ে নিল অমিয়, তারপর উদ্বিগ্ন সংযত কণ্ঠে বললো, 'কি বলুন তো ?'

চোখা নাকমুখ চোখা চিবুক ও চোখে গোঁফওয়ালা লোকটা পুনরায় বললো, 'আমরা কালও এসেছিলাম—এখানে এক ভদ্রলোক ছিলেন চশমা-পরা, অনেক লোকের সংগে কথা বলছিলেন তিনি। বললেন অপেক্ষা

করতে। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক বসে থেকেও ভদ্রলোকের সময় হলো না আমাদের কথা শোনবার—অবশ্য তার দোষ দিই না, তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তা আজ আমরা এসেছি, আমাদের কথা আজ শুনিয়ে যাবই।'

'ওঃ এই ব্যাপার ?' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো অমিয়। টাইপ করতে থাকা মেয়েটি একবার তাকালো এদিকে, এবং মুচকি হেসে পুনরায় টাইপ করতে লাগলো। আগন্তুক-ত্রয় তখনো বসেনি দেখে অমিয় আবাব অনুরোধ করলো বসার জন্য। তাদের দুজন দুটো চেয়ারে এবং তৃতীয়জন একটি টুলে বসলো। অমিয় বললো, 'এইবার বলুন ধীরে সুস্থে।'· 'বিড়ি খান?'—অমিয় তিনজনকে তিনটা বিড়ি দিলো।

বিড়ি ধরিয়ে লোকটা আরম্ভ কবলো, 'আমরা উদ্বাস্তু—তা এখানে আসছি মাসেকের ওপর হ'লো। ক'দিন শিয়ালদা ষ্টেশনেই পড়েছিলাম। ব্যাপার স্যাপার সব দেখলাম। দু'চারদিন ঘোরাঘুরির পর বুঝলাম বাবুভুঁইয়াব পেছনে ঘুরলে আমাদেব চলবে না। তাই কোমর বেঁধে নিজেরাই লাগলাম। এখন মুরারীপুকুর এলাকার একটা খালি প্লটে আমরা ছোটখাট ঘর তুলে আছি। তা জানেনই তো আমাদের অবস্থা, এখন আর কি করতে টরতে হবে বলুন—'

এক নিঃশ্বাসে লোকটা বললো। অমিয় জিজ্ঞেস করলো, ঘবদরজা তুলেছেন ? প্রত্যেকে ?

লোকটা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

'বেশ করেছেন। আমাদের জানিয়েছেন, ভাল কবেছেন। আপাততঃ আর কিছু কবতে হবে না আপনাদের। · কত ঘর আছেন সেখানে ?'

নিজেদের মধ্যে হিসেব কবে লোকটি উত্তব দিলো, 'তেতাল্লিশ ঘর। তবে আরও কিছু জায়গা খালি আছে। কিছু লোক আরও বসানো যায়, আমরা জানা শোনা লোক খুঁজছি।

'বেশ। সমস্তটা প্লট ভর্তি করে নেবেন।···নিজেদের মধ্যে কোন-রকম গোলযোগ নেই তো?' অমিয় একটু যাচাই-করে-নেওয়া দৃষ্টিতে লোকটির পানে তাকালো।

উত্তরটাও এলো তৎক্ষণাৎ। 'না না ওসব চোরামি ঠগামি আমাদের মধ্যে হতেটতে দেব না, জেনে রাখবেন। হাতে এখনো জোর আছে।' বলে লোকটি হাতের মুঠো শক্ত করলো।

'হ্যাঁ, ঐ দিকটা খুব ভাল করে খেয়াল রাখবেন। নিজেদের মধ্যে যদি মিলমিশ না থাকে তো, পরে কিন্তু আটকাতে পারবেন না।'

'সে আর জানিনে মশাই, সেজন্যই তো বাবুভুঁইয়ার পেছনে আমরা নেই।'

'আপনাদের মুরারীপুকুর এলাকা, না?' বলে অমিয় একটু ভাবলে। তারপর বললে, 'ঐ এলাকায় আমাদের লোকজন কাজকর্ম করে, তা ওদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবেন।'

'হ্যাঁ আপনাদের লোকজনকে ঐদিকে কাজকর্ম করতে দেখি। আমাদের ওখানে কাল দু'জন গিয়েছিল, ওদের কথায়ইতো আমরা এখানে এসেছিলাম।'

'বেশ, আপনাদের যখন যা দরকার হবে—মানে অষুধপত্র দুধ বা আর কোন পথ্য—ওদের জানাবেন বা এখানে আসবেন, পাবেন। মানে, আমাদের যতদূর ক্ষমতা আছে, আমরা আপনাদের পেছনে দাঁড়াবো। তা বোঝেন তো শুধু আমাদের দাঁড়ালেই তো হবে না, আপনাদেরও দাঁড়াতে হবে।'

'সে আর বলতে হবে না মশাই, সে কলকাতা এসেই বুঝে নিয়েছি, নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কিছুই হবে না—একবার ঘর পুড়েছে মশাই, আর কি সংজ্ঞে ঘর পুড়তে দেবো?'

'ওঃ আপনাদের আসল কথাই বলা হয়নি—' এই বলে অমিয় কয়েক তা সাদা কাগজ বের করে বললো, 'এই কাগজের মধ্যে আপনাদের সকলের নামধাম, কোথায় বাড়ী, কোন জেলা, কে কি কাজ করতেন বা করতে পারেন ইত্যাদি সব বিস্তৃতভাবে লিখে আমাদের এখানে দিয়ে যাবেন।…দেরী করবেন না, কালপরশু দিলেই ভাল হয়…'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, দিয়ে যাব কালই—'

'আপনাদের কারো কাজকর্ম করতে আপত্তি নেই তো ?'

'আপত্তি ? কার ক'টা জমিদারী মশাই যে কাজ করবে না ?'

'বেশ বেশ—আমাদের কাছে মাঝে মাঝে কাজকর্মের খোঁজ আসে কিনা, অনেকে লোক চায় যেমন ধরুন তাঁতের কাজ জানা, বা মিস্ত্রিগিরি জানা, অথবা কাপড়ের বা গেঞ্জিব মিলে কাজ করছে এমন লোক অনেকে চায়। আপনাদেব মধ্যে এমন কেউ থাকলে দেখব চেষ্টা করে কোথাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কি না, বুঝলেন ?'

এরা পবস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো। উৎসাহ-আগ্রহে চোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এদেব। মুখপাত্রটি বললো, 'খুব উপকার করলেন মশাই খবরটা জানিয়ে ; আমাদের মধ্যে অনেকেই তো এসব কাজ একটু আধটু জানে। আপনার সংগে আলাপ হয়ে কি ভালই হলো !'

অমিয় বাধা দিয়ে বললো, 'ওসব কিছু নয়, আমাদের তো এ-ই কাজ।'

'আপনার সংগে এতক্ষণ আলাপ করছি, আপনার নামটা তো জানা হলো না—' মুখপাত্রটি সংকোচেব সংগে বললো এবং বলে হাসলো। সংগীরাও মৃদু হাসলো, যেন কৃতজ্ঞতার হাসি।

'অমিয় দাস।'

'আপনাকে কি এখানেই পাওয়া যাবে ?'

'হ্যাঁ—না—আমি শিয়ালদা স্টেশনেই বেশীর ভাগ সময় থাকি, তবে এখানে এলেও পাবেন। আর আমাকে না পেলেও অমরবাবু, অনিলবাবু এঁদের খোঁজ করবেন,—আর ওদের না পেলে একে বললেও সব হ'বে—' বলে পাশের দাঁড়ানো ছেলেটিকে দেখিয়ে বললো, 'এর নাম মৃণাল।'

'আপনাদের নাম কি?'

পূর্বোক্ত বক্তা বললো, 'আমার নাম নিবারণ সাহা—এর নাম রমেশ পাল, এর নাম যোগেশ মণ্ডল।'

প্রতিদিনকার মত রিপোর্ট নেওয়ার জন্য কল্যাণ এসে হাজির। টাইপ-করতে-থাকা মেয়েটি একবার চোখ ফিরিয়ে তাকালো। কল্যাণ বসলো একটা চেয়ারে।

'অমিয়বাবু, আমাদের ওদিকে একদিন চলুন না, আমাদের প্লটটি দেখে আসবেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় যাব একদিন।'

'কবে যাবেন বলুন। কাল পরশু—'

ঠিক কথা দিতে পারলাম না দাদা, 'বোঝেনইতো সহস্র কাজে ব্যস্ত থাকি। তা আমি সকালের দিকে এরই মধ্যে একদিন যাব, আর ঐ এলাকার আমাদের কর্মীদের সংগে ভাল করে আপনাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব। কেমন?'

'আচ্ছা।' নমস্কার করে নিবারণ সাহা উঠল, তার সংগীরাও।

অমিয় আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো, 'এ কাগজগুলো কিন্তু কাল-পরশুই দিয়ে যাবেন।' একটু থেমেই বললো, 'জমিদার যদি পুলিশ নিয়ে ঘর ভাঙতে যায় তো পারবেন তো ঠেকাতে?'

নিবারণ সাহার চোখে যেন অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। জ্বলে উঠল যেন সে। বললো, 'আমরা বিক্রমপুরের লোক, পদ্মার মার-খাওয়া

লোক। রাক্ষুসী ঘর ভাঙে, আমরা গড়ি। মার খাই, মারিও; মার খেয়েছি, মেরেছি। আমাদের কি অত সহজে ভয় পেলে চলে?'

নিবারণ ও তার সংগীরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অমিয় ওর পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখে মনে হয় বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের বেশী নয়। কালো দৃঢ় গড়ন শরীরের। অমিয় মনে মনে বলে, জোর আছে নিবারণের দেহে।

কল্যাণও বিস্মিত হয়েছিল। শেষের কথাটায় অবাক হয়ে সে তাকিয়ে ছিল বক্তার মুখের দিকে। কেমন যেন একটা অদৃশ্য আগুনের তাপ ওকে স্পর্শ করলো বলে ওর মনে হ'লো। তাড়াতাড়ি নোট বইখানা বের করে ও টুকলো, 'আমরা পদ্মার মার-খাওয়া লোক···।'

কল্যাণই বললো, 'ভেতরে জিনিষ আছে রে, কাজ হবে।'

অমিয়ও স্বীকার করলো, কাজ হবে ওদের দিয়ে। আর মনে মনে স্থির করলো, কাল সকালেই ওদের প্লট দেখতে যাবে।

অরুণা দত্তকে টাইপ করতে দেখে কল্যাণ বিস্মিত হয়েছিল। বললো, 'তুমি এখানে?'

'আজ ননীদা ছুটি নিয়েছে, তাই ডিউটি আমার।'

'কি করছো ওটা?'

'একটা স্টেটমেণ্ট। প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারির নামে যাবে, সাহায্যের আবেদন করে, আর কোথায় কোথায় আমাদের অর্গেনাইজেসন কাজ করছে, ইত্যাদি আর কাজের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে।'

'দিদি কোথায়?'

'রাণাঘাট গিয়েছে।'

'একলা না কি?'

'না ডাঃ সাহা গিয়েছেন, সেক্রেটারি গিয়েছেন, আরও কে কে যেন সব গিয়েছে ; ক্যাম্পের অবস্থা দেখার জন্যে—' বলে অরুণা পুনরায় মন দিল টাইপে। দ্রুত চলতে লাগলো ওর আঙুল, যেন দ্রুতলয়ে নৃত্য করছে আঙুলগুলো। কল্যাণ তাকিয়ে রইলো খানিক্ষণ। ইচ্ছে হলো, নৃত্যের তালটা বুঝে নেয় সে, আর নোটবুকের পাতায় গেঁথে রাখে।

অমিয় হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ করে বলে ওঠলো, 'জোর পাচ্ছি আমি মনে, বিশ্বাস ফিরে আসছে আমার।'

'অকস্মাৎ' ? কল্যাণ প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ ; মাঝখানে মনটা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে এই জীবন্ত বীভৎসতা দেখে মনে হয়েছিল এখনই এর অবসান চাই, যা কিছু আছে শক্তি সব নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ি—'

'আমি তো এখনো তাই মনে করি।' অরুণা বললো। 'দিনের পর দিন অষুধ খাইয়ে আর দুধ খাইয়ে ভাল লাগে না আমার। একটা যে কিছু করছি বুঝতেই পারিনে—'

'ঐখানটায় আমারও ভুল হয়েছিল, তোমারও হয়েছে—'

'আমার কিন্তু খালি মনে হয় সময় পার হয়ে যাচ্ছে, এক মিনিট দু' মিনিট করে সময় পার হয়ে যাচ্ছে—' অরুণা আবার প্রতিবাদ করলো।

'সে ভুল আমার এখন ভাঙলো। এখন, এই মুহূর্তে—'

'মানে ?'

'ঐ যে লোকটা এখন কথা বলে গেল, এমনি হাজার হাজার লোক আজ ঘরছাড়া। হাজার হাজার লোক তো নয়, যেন হাজার হাজার শক্তি-কণিকা। একে সংঘবদ্ধ রূপ দিতে হবে, আর সেজন্যই সময়ের প্রয়োজন। এর আগে আমি শুধু উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম, উচ্ছ্বাসটাকেই শক্তি বলে ভুল করেছিলাম, মনে করেছিলাম তাকে নিয়ে যে কোন কাজ করা চলবে।

আজ শক্তির পরিচয় পেয়েছি, তাকে ঘরের বাইরে টেনে আনতে সময় নেবে—'

'আমার কিন্তু এখনি একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে, ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে কোন একটা তরঙ্গে—'

'সেটাও তোমার শক্তি নয়, উচ্ছ্বাস।'

'কিন্তু যেভাবে আর্তের সেবায় আমরা লেগে গেছি, তাতে সেবাটাই যে সর্বেসর্বা হ'য়ে ওঠলো'—বক্তা কল্যাণ।

'বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয় অবশ্য—'

'ভেতরেই বা কি করছি?'

'সেটা প্রকাশ পেতে সময় নেবে বই কি! তবে আমার কথা হ'লো সে সময়টা যেন আমরা শক্তির সন্ধান করে বেড়াই, নইলে কোন লাভই হ'বে না।'

কল্যাণ বলতে লাগলো, 'আমার তো সেই কথা। দুর্গত মানবের সেবা করে এ সমস্যার সমাধান হ'বে তা আমি বিশ্বাস করি না, তুইও করিস না। আর যেভাবে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ফুলে ফুলে আসছে, তাতে আজ যে অষুধটুকু দিতে পারছি, কাল হয়তো তা-ও পারবো না, পুনর্বাসন তো দূরের কথা। আর গভর্ণমেণ্ট তো তা করতে পারেই না, অথচ পারাটা গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতার মধ্যে। ক্ষমতা থেকেও গভর্ণমেণ্ট কেন পারলো না, একথাটাই বুঝে নেওয়ার জন্য একদিন এইসব ছিন্নমূল মানুষ-গুলোকে গভর্ণমেণ্টের সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে—'

'নিশ্চয়।'

'এবং সেদিন যেন তাদের শক্তির অভাব না হয়।'

'তা তো বটেই। সে দায়িত্ব তো আমাদেরই গ্রহণ করতে হবে।'

'শুধু তা-ই নয়, কেন গভর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কেন বাস্তুহারাদের গভর্ণমেণ্টের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, কোন পথে সমাধান, ইত্যাদি বোঝানো এবং বুঝিয়ে ওদের মনকে তৈরী করার দায়িত্বও আমাদেরই।'

'আমার তো মনে হয় সংগ্রামের ডাক পড়লে ওরা আপনা থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়বে', অরুণা বললো। ইতিমধ্যে ওর টাইপ শেষ হয়ে গেছে, এবং সে কল্যাণের কাছে একটা চেয়ারে এসে বসেছে। পরিশ্রান্ত আঙুলগুলোকে টানতে লাগলো সে।

'ওখানেই মস্ত ভুল, অরুণা। আমরা সাধারণত মনে করি প্রচার আর বিশ্লেষণ করাটা এমন কোন বিপ্লবী কাজ নয়। আসলে এর সাহায্যে মানুষের মনকে তৈরী করা সব চেয়ে বড় বিপ্লবী কাজ; মানুষের মত তৈরী থাকে না বলে, কত বিপ্লবের মুহূর্ত যে পার হয়ে যায়, যাচ্ছে, তার কে খবর রাখে?'

'আমাদের সমস্ত কর্মকে সেই দিকেই নিয়োজিত করতে হবে, সেইটেই আমার কথা।' অমিয় বললো।

'আমাদের সকলের কথা বল।' কল্যাণ বললো।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সকলের কথা।' অমিয় হাসলো।

কল্যাণ বলতে লাগলো, 'আমার নিজের কি ধারণা জানিস,—ঐ তুই যাকে শক্তি বললি—এখানে সত্যি বিপ্লবের মাল মসলা জমা হয়ে আছে। মনের দিক থেকে অনেক বন্ধন ওদের শিথিল হয়ে গেছে। আমাদের দিক থেকে এটা একটা শুভ লক্ষণ। তারপর, অনেকেই জীবনের দায়ে লাজ লজ্জা সরম ছেড়ে যে কোন কাজ করতে বাধ্য হ'চ্ছে, শিক্ষা-দীক্ষার গরিমা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সে দিক থেকে মধ্যবিত্তের মনে যে ভুয়া সম্মান ও মর্যাদা বোধ তা-ও ক্রমে ক্ষয় হচ্ছে

যাচ্ছে। এও আরেকটা শুভ লক্ষণ;...আরেকটা ব্যাপার হলো, এই দারুণ অবস্থায় পড়ে এরা ভীষণ মারমুখো হয়ে ওঠছে।...'

'ঠিক ঠিক; ঠিক বলেছিস।'

'তাই আমার মনে হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন কর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে ওরা।'

'আমিও ঠিক ঐভাবেই চিন্তা করেছিলাম। তবে তোর 'হয়ে যাবে'র জায়গায় হয়ে গেছে মনে করেছিলাম। এই ভুল করেছিলাম বলেই আমি এতো তাড়াহুড়া করছিলাম।'

'এ তো তাড়াহুড়ার ব্যাপার নয়,' কল্যাণ বললো।

'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি রিলিফ ওয়ার্কের ভেতর দিয়ে এদের শ্রদ্ধা অর্জন করা আমাদের কাজের দিক থেকে কতখানি প্রয়োজনীয়—।'

'হ্যাঁ, এরা সর্বতোভাবে তোকে বিশ্বেস করলেই তো তোর কথায় প্রাণ দিতে ছুটে আসবে, নইলে কি আসবে?'

'আমার তো মনে হয়, বিশ্বাস ফিশ্বাসের প্রশ্ন এখানে বিশেষ নেই, পেটের দায়েই মানুষ এগিয়ে আসবে।' অরুণা পুনরায় বলে।

'ঠিকই, পেটের দায়ে এগিয়ে আসে, আবার প্রাণের দায়ে পালিয়েও যায়।' কল্যাণ বললো।

'বুঝলাম না।'

'বুঝবে না, জানা কথা। অমিয় বলে এটা তোমার উচ্ছ্বাস, আমার মনে হয় এটা তোমার গোঁয়ার্তুমি।'

'ইস্, খুব তো বুঝেছ আমাকে।'

অমিয় ও কল্যাণ হাসলো। একটু বাদেই অরুণাও হাসলো।

ক্ষণিক এমনি কাটলো। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় কল্যাণ হাসলো।

অমিয় অন্যমনস্ক ছিল, তাই একমাত্র অরুণাই এই হাসিতে আকর্ষিত হলো। বললো, 'কি ?'

'ভাবছিলাম একটা মজার কথা। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস তো বলে যে যারা যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক সময় যুদ্ধ শেষ হয় না। আমাদের দেশের বেলায়ও যেন একথাটা খাটছে। যাঁরা দেশ ভাগাভাগি করেছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিসটা আর চললো না, চলছে না। তাঁরা মানুষকে বাদ দিয়েছিলেন ; সেই মানুষই আজ পথে নেমে আসছে হিসেব চুকিয়ে নেওয়ার জন্যে।'

উদ্বাস্তু গমনাগমনের মধ্যে কি তারই আভাস ? অরুণা আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকে। অকস্মাৎ যেন ঘরটা একান্তই নীরব হয়ে যায়। এই নীরবতার মধ্যে সমস্ত স্তব্ধতাকে কোলে করে যেন ভেসে বেড়ায় কয়েকজন কর্মীর মানুষকে বাঁচানোর আশা, নতুন সমাজকে সৃষ্টি করার স্বপ্ন, আর পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখার আলো। এই আলোর জোরেই ঘরের স্তব্ধতাকে মনে হয় বাঙ্ময়, আর বিকেলের নিভে-আসা আলোতে দেখা যায় নব অরুণোদয়ের দীপ্তি।

তাদের সকলের স্বপ্নঘোর ভেংগে দিয়ে কল্যাণ জিগ্যেস করলো, 'কিছু দেবে টেবে নাকি আজ ?'

'ষ্টেটমেণ্টের এক কপি নিয়ে যাও।' অরুণা বললো।

ষ্টেটমেণ্টের একটা কপি গ্রহণ করতে করতে কল্যাণ বললো, 'তোমাদের শো'র একটা টিকিট দিলে না ?'

'কম্প্লিমেণ্টারি নাকি ?'

'পাগল ? যথার্থ মর্যাদা না দিয়ে আমি কারো নাচগান শুনি না, আর তোমার তো নয়ই।' কল্যাণ হাসলো, একটু দুষ্টুমি মিশ্রিত হাসি।

'হয়েছে, পাকামো করতে হবে না।' অরুণা হাসলোও না, গম্ভীরও হলো না।

কল্যাণ অমিয়কে বললো, 'তা বিভোর হয়ে গেলি যে, চল একটু বেরুবি নাকি। অমিয় হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'মাত্র কুড়ি মিনিট বাজে খরচ করতে পারি। তা চল।'

'আমি?' অরুণা জিজ্ঞেস করলো। পাতলা গড়ন শ্যামবর্ণা মেয়েটি। দেহের আর সব কিছুকে ছাপিয়ে আছে দুটো চোখ, দুটো চঞ্চল চোখ। কল্যাণ এই আব্দারের কোন জবাব দিলো না। অমিয় কি জানি কি ভাবলো, তারপর বললো, 'তা চলো।'

•

বিজয় ডাকতে লাগলো, 'বৌদি বৌদি, শোনো৷ ছেলে তোমার নাকি লেনিন হবে, শুনেছ?'

বিজয় মানে বিজয় চৌধুরী। কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপক। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের সহ-কর্মী। গড়নটা মোটাও নয়, বিশেষ পাতলাও নয়। লম্বা তীক্ষ্ণ চিবুক, তদ্রূপ নাক, ভাব-মুগ্ধ চোখ, তার ওপর কালো ফ্রেমের চশমা। শ্যামবর্ণ।

আর বৌদি মানে শান্তি দাস, অমিয়র স্ত্রী। ওদের ছেলে অভিজিৎকে নিয়ে খেলা করতে করতে বিজয় কথাটা বললো। বৌদি এলো না, তবে ভেতর থেকে গলার আওয়াজ এল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ কত কিছু হ'বে দেখবো।'

'তোমার ঐ এক কথা, কিছুতেই উৎসাহ দেবে না।'

শান্তি চা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একটু বাদেই এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। গৌর বর্ণ, বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে। পরণে আধ-

ময়লা কাপড় ও সেমিজ। হাতে একগাছি করে চুড়ি ও শাঁখা। কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না, এমনি গোছের। অর্থাৎ, ঘরে ঘরে প্রতি নিয়ত যেসব মেয়েদের আমরা দেখে থাকি, কারণে অকারণে যাদের সংগে পরিচিত হয়ে থাকি, এ তাদেরই গোষ্ঠীর একজন। বিজয় আব শান্তির মধ্যে বয়সের পার্থক্য চার-পাঁচ বছর হ'বে, তবে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা মধুব বলে ওরা আপোসে পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করে।

সার্পেনটাইন লেনের একটি ঘরে বিজয় বসে ছিল। দৈর্ঘ প্রস্থে তা পাঁচহাত সাড়ে পাঁচহাতের বেশী হবে না। ঘরে একটি ছোট ময়লা বিছানা। ছোট্ট একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। পাশেই অনুরূপ আর একটি ঘরে একটি বিছনা পাতা, এবং সংলগ্ন বারান্দায় গৃহস্থালি ও রান্নার সরঞ্জাম। এখানে অমিয়বা থাকে। আলোবাতাসের প্রবেশ পথ যেন বাড়ী তৈরীর সময়েই সযত্নে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দালানেব আকার দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

শান্তি ঘবে প্রবেশ করতেই বিজয় অভিজিৎকে পুনবায় জিগ্যেস করলো, 'কোনটারে লেনিন, কোনটা?'

দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে অভিজিৎ বলে, 'ঐ, ঐটা।'

'দেখছো, ছবি পর্যন্ত চিনে নিয়েছে।' বলে বিজয় দেওয়ালের অন্যান্য ছবিগুলোর প্রতিও চোখ বুলিয়ে নিলো, যদিও সবগুলিই তার অজস্র বার দেখা ছবি। লেনিনের পাশে সেখানে বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রোঁলা, টলষ্টয় ও কর্লমাক্স।

শান্তি বললো, 'তবেই হয়েছে আর কি!'

'হবে হবে।'" হবি নারে অভিজিৎ, খুব বড় হবি না?'

অস্ফুট স্বরে অভিজিৎ জানালো সে এ্যাত্তো বড় হবে, এবং বড়র পরিমাণটা লাফিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলো। বিজয় হাসলো, শান্তিও। তথাপি শান্তি যেন আগের কথারই রেশ টেনে বললো, 'তবু বুঝবো যদি ওঁদের পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মতও হোস্।'

অকস্মাৎ হালকা হাসি মিলিয়ে গিয়ে যেন গম্ভীর হয়ে গেল শান্তি। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললো, 'সবাই তো সব কিছু করছে, ছেলেকেও তোমরা লেনিন বানালে, একমাত্র আমিই পৃথিবীর কোন কাজে লাগলাম না ভাই।'

'কেন, তুমি তো এর মাঝেই লেনিনের মা সেজে বসে আছো!' বলে বিজয় জোরে হেসে উঠলো।

'না, হাসির কথা নয় ঠাকুরপো। আমার জীবনটা কোন কাজেই যে লাগলো না।'

বিশেষ লেখাপড়া জানেনা বলে শান্তির বরাবরই দুঃখ ছিল, আর আপ্রাণ চেষ্টা করেও নানা ঝঞ্ঝাটে যখন বেশীদূর সে অগ্রসর হতে পারলো না, এবং অমিয়র কাজে কর্মে বিন্দুমাত্র সাহায্য করার যোগ্যতাও সে অর্জন করতে পারলো না, তখন নিজেকে কোনভাবেই সে আর সামলাতে পারলো না। অপরিসীম নৈরাশ্য ও বেদনায় সে ভেংগে পড়লো। আর এই না-পারার দুঃখটা যেন একটা তীব্র ব্যাধির মত তাকে পীড়া দিতে লাগলো, সময়ে অসময়ে মনটাকে তার ভারাক্রান্ত করে তোলে।

বিজয় পুরোপুরিভাবেই জানে শান্তিকে। তাই তার বিমর্ষতাকে নানা ভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে, নিয়মিত আড্ডা দিয়ে শান্তিকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়। আজও তেমনি ভাবেই বললো, দৃষ্টিটাকে একটু প্রসারিত করো দেখি বৌদি।'

'বৃথাই। কি হবে বলো তো?'

'বড়র দিকে চোখ না রাখলে বড় হওয়া যায় না।'

'তোমার এ কথা শুনে শুনে আমার কান খারাপ হওয়ার যো হ'লো। কিন্তু আমার যে ক্ষমতায় কুলোয় না, সেটা তুমি বোঝ না।'

'খু-ব কুলোয়।'

'ছাই কুলোয়। দেখলে তো চেষ্টা করেও কিছু হ'লো না।'

'চেষ্টাই করলে না তো হ'বে কি।'

'করেছি গো করেছি। না পেরে ছেড়ে দিয়েছি। বড়র দিকে চেয়ে আমার লাভ নেই আরও বেশী করে দুঃখ সঞ্চয় করা শুধু।'

'তা যদি ছেড়ে থাকো তো আফসোস করাও ছেড়ে দাও। কিছু হ'লো না বলে হা-হুতাশ করে লাভ কি।'

'হুঁ।' বলে চুপ করে রইলো শান্তি।

বিজয় বললো তোমার এই দীর্ঘশ্বাস ভাল লাগে না বাপু।.. আয়রে অভিজিৎ আমরা খেলা করি।...মা-টা ভাল না, নারে?'

'একটুও না, আমায় লেনিন হ'তে দ্যায় না কিচ্ছু না।'

বিজয় চোখ তুলে শান্তির দিকে তাকালো। ম্লানমুখে শান্তিও হাসলো কিন্তু বড মলিন দেখাচ্ছে ওকে, চোখে যেন কোন এক মুহূর্তে জল দেখা দিয়ে পাতাগুলো ভিজিয়ে দিয়ে গেছে একটুখানি। যেন একটু অবসন্নও দেখাচ্ছে শান্তিকে। কলকাতায় বিকেলের রোদ ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান করেছে। এবাড়ীর ওবাড়ীর ছায়ারা পরস্পর মিশে অন্ধকার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে। এই অন্ধকারের মধ্যে যেন অনায়াসেই মিশে যেতে পারে শান্তির মুখশ্রী। বিজয়ের চোখে শান্তিকে এমনি বিষণ্ণ দেখালো। কিন্তু চিন্তাটা মনে হতেই ওর মনটা যেন মুষড়ে গেল। চিন্তাটা ঠিক হয়নি, কিছুতেই ঠিক হয়নি বলে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো।

বিজয় চুপচাপ একটা সিগারেট ধরালো। নীরবতা ভাঙ্গলো কিন্তু শান্তিই। জিগ্যেস করলো, আরেক কাপ চা দিই।'

'না।'

'না, খাও আরেক কাপ।' একথা বলে সে ঘরের বাইরে যাবার আগেই আলগোছে বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো, অনিমা দত্ত। অরুণার দিদি। একটু লম্বাটে গোছের, তামাটে গায়ের রং। বেশভূষা সাধারণ, সরু ফ্রেমের চশমা চোখে।

'আরে অনিমা দি ?'

'হ্যাঁ।...বাঃ তুমিও এখানে ?'

বিজয় হাসতে লাগলো।

'হ্যাঁ ভাই, এইমাত্র নামলাম ট্রেন থেকে। রাণাঘাট গিয়েছিলাম অফিসে যাওয়ার পথে ভাবলাম শান্তিকে একটু জ্বালাতন করেই যাই।...অভি, পিসীমা এসেছে....আয়...।'

'ইস্ ভারিতো,' শান্তি বললো।

'রাণাঘাট গিয়েছিলে ? কেন ?' বিজয় জিজ্ঞাসা করলো।

'কুপারস ক্যাম্প দেখতে। উঃ কী যে বলবো ! কী দুরবস্থার মধ্যেই যে আছে মানুষগুলো, আর কী দুর্দশাই যে ভোগ করছে, আশ্চর্য ! জল কাদার মধ্যে বিছানা পত্তর কিছু নেই, খড় বিছিয়ে পড়ে আছে। আর এদিকে ম্যালেরিয়া, ওদিকে টাইফয়েড, ঐদিকে কলেরা, সব কিছু মিলে বেশ একটা—'

'অমরাবতী সাজিয়ে রেখেছে।' বিজয় যোগ করলো।

'সত্যি অমরাবতীই বটে ! মানুষের জীবন নিয়ে এ যে কী চলছে—'

'মরছে টরছে নাকি কিছু ?' কেমন নির্লিপ্ত ভাবেই যেন বিজয় জিগ্যেস করলো। শান্তি চমকিত হলো একটু।

'মরছে ?' রোজ পাঁচটা সাতটা করে। এর মধ্যেই বোধ হয় শখানেক হয়ে গিয়েছে, আরো কত যে হবে তার হিসেব নেই।'

'যাই বল না কেন, গভর্ণমেণ্ট কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার করবে না।'

'তা করতে যাবে কেন বল ? স্বীকার করলেই মানতে হবে যে নিজের চেহারাটাই কুৎসিত।....আর কী রকম ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখো, যারা শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে রাণাঘাট ক্যাম্পে গিয়েছিলো, তাদের অনেকেই লুকিয়ে চুকিয়ে আবার ষ্টেশনে চলে আসছে,—'

'অতটা আরাম বোধ হয় ওদের সহ্য হলো না।'

শান্তি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু শুনছিল, কোন কথা বলেনি। এবার অকস্মাৎ বলে উঠলো 'একটু থামো তো অনিমা দি, সব সময় তোমাদের এসব গুরুতর আলোচনা মোটেই ভাল লাগে না আমার।' বেশ একটু আবেগ দিয়েই বললো।

'থামবো ? বেশ, যদি একটু চা দাও—' অনিমা হাসি-মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

শান্তি কুট্‌কুট্ করে হেসে ফেললো। তারপর মাথা নেড়ে চলে গেল। কিন্তু মিনিট পনের বাদে দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে এসেও সে দেখতে পেল, ওরা দু'জনে চুপচাপ বসে। বিজয় সিগারেট টানছে, অনিমা আপন মনে না জানি কি সব ভাবের চক্র সৃষ্টি করে চলেছে। অভি বাইরের দরজার সিঁড়িতে বসে আপন কৌতুকে মত্ত। সন্ধ্যার মোলায়েম অন্ধকার নিঃশব্দে ঘিরে ফেলেছে ঘরটাকে। শান্তি বললো, 'ও মা একেবারে চুপচাপ বসে ?'

'বাঃ তুমি যে আদেশ করলে।...আর নইলে তো চা পেতাম না।' অনিমা বললে। কিন্তু অন্ধকারে ওর হাসি দেখা গেল না।

'আমি কি কথা বন্ধ করে বসে থাকতে বলেছিলাম? ও ছাড়া কি আর কোন কথা ছিল না?'

'আর কোন কথা—কি কথা থাকবে বলো?'

'আর সে জন্যে রা-টি বন্ধ করে—'

'অগত্যা'। বিজয় বললো।

'বাতিটাও তো জ্বালাতে পারতে, তাও তো একটা কাজ হতো।' বলে শান্তি সুইচটা টিপলে।

বালবের আলোয় স্পষ্টই বুঝতে পারলো সকলে বাইরের অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। শান্তি ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো, ওদের চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বারবার তাকালো। সেখানে কী রহস্য লুকানো রয়েছে তা যেন সে আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু সেখানে যে শব্দহীন গাম্ভীর্য বিরাজিত রয়েছে, তার গভীরতা কতখানি তা সে পরিমাপ করতে পারলো না, বা কি ভাবে তা পরিমাপ করা সম্ভব, তার কোন হদিসও সে খুঁজে পেল না। তথাপি সাহসে নির্ভর করে কতকটা রহস্য সৃষ্টির জন্য কতকটা লঘুভাবে সে প্রথমটায় মুচকি হাসলে, তারপর বললো, 'বুঝেছি।'

'কি আবার বুঝে বসলে হঠাৎ?' বিজয় জিগ্যেস করলো।

'অনেক সময় কোন কথা না বলেও অনেক কথা বলা যায়—'

'তাই নাকি?' অনিমার যেন আবহাওয়াটা হালকা করার চেষ্টা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ যায়; আর তোমরা সে কথাই বললে এখন। বলে শান্তি উৎসাহের সংগে আবার তাকালো ওদের পানে।

অনিমা হেসে উঠলো।

বিজয় বললো, 'পাগল আর কি! এবং চায়ের কাপে শেষ চুমুক লাগালো।

চার

জীবন-নয় অবস্থাব অত্যাচারের প্রকোপ যতই বাড়তে লাগলো, কমলা রায় আশ্রয়-অবলম্বন সম্পর্কে ততই হতাশ হতে আরম্ভ করলো। শুক্‌নো দেহটা এই হতাশার ভারে যেন আবো বেশী এলিয়ে পড়ছে। কিন্তু, আশ্চর্য, দেহ ভাংলেও যেন মানুষের মন ভাংগে না, ভাঙ্গা দেহটাকে জোড়া দিয়ে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে ফুটে ওঠতে চায়! কমলা রায়ও তার হতাশার শত শত ছিন্ন টুক্‌রো-গুলোকে একত্র সংগ্রথিত করে একটা অখণ্ড আশা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কখনো তার একথা মনে হয় না যে শত শত ছিন্ন হতাশার টুকুরোর সমন্বয়ে একটা পূর্ণ আশা গড়ে উঠতে পারে না। আশা হতাশার জাত আলাদা, আশা আশা হতাশা হতাশা।

মনেব এমনি এক দুর্মর সংগ্রামশীল অবস্থায় সে আবিষ্কার করলো একটি মানুষকে, একটি কর্মীকে। সে জানে না কি তার নাম, কি তার পেশা, কি তার যোগ্যতা, কিন্তু তাব চলনবলন থেকে স্বতঃ-স্ফূর্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে একটা শক্তি। সে অনুভব করে সেই দুর্দমনীয় শক্তিকে। অবাক বিস্ময়ে সে চেয়ে থাকে, বোধ হয় অপ্রত্যাশিত আশার এক ঝলক বিদ্যুৎ আলোকিত করে যায় তার মন। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু, পরক্ষণেই, সেই মানুষটির ব্যস্ত-সমস্ত চলে যাওয়ার সংগেই অন্ধকার যেন নেমে আসে কমলার মনে। সে তার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় থাকে।

প্রত্যাগমন করেও সে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে হুকুমদারি করে, বিনয়নম্রতায় পড়ে থাকা মানুষগুলোর সংগে কথা বলে। সে প্রতীক্ষায়

থাকে কখন সে তাকে আপনা থেকেই এসে দু'টো কথা জিজ্ঞেস করবে, কখন সে কমলাকে এই জীবন-নয় পরিবেশ থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু বহু প্রতীক্ষাকে উপেক্ষা করে সে আসে না, কথা বলে না। ক্ষোভে দুঃখে কমলার মনটা পুনরায় ভেংগে পড়তে চায়। তার জীবনকে কেন যে কেউ মর্যাদা দিতে চায় না, সে অবাক হয়ে ভাবে।

কিন্তু তবু কমলার মন শ্রদ্ধায় নত হয়। যার-নাম-সে-জানে-না এবং যে-এলো না তাদের দলের কর্মীদের হাতে পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটির ব্যাজ্ সে দেখেছে, আর দেখেছে সে তাদের শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়কে, মার-খাওয়া মানুষের সেবার অনুরাগকে। সেখানে, সেই স্বার্থহীন আত্মোৎসর্গতার মধ্যে এমন একটা কিছু সে দেখে, যাকে সে শ্রদ্ধা না করে পারে না; যদিও, যার-নাম-সে-জানে-না সে তার প্রতীক্ষার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেয়নি। সেক্ষেত্রে কিভাবে যেন সে নিজেকে ভুলে যায়। কিন্তু, তথাপি, স্বার্থ-সম্পর্কের মধ্যে আবিষ্ট মানুষের মন; কমলা নিজেকে আবার বড় করে দেখতে আরম্ভ করে, আর সংশয়ে দোলে।

কিন্তু, অবশেষে, সে এলো, যার-নাম-সে জানে না।

সেদিন নিদারুণ ঝড় বইছিল কলকাতা ও সহরতলীতে। প্রচণ্ড বেগে-বওয়া বাতাস আর বৃষ্টির হুঙ্কারে আকাশ পৃথিবী মেতে উঠেছিল। সেই মাতলামো এতই উদ্দাম যে, মনে হয় এই বুঝি বা পৃথিবীর শেষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার পর সন্ধ্যায়ও তার বিরাম হলো না, মানুষের মন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। শিয়ালদা ষ্টেশনের আশ্রয়শালায় যারা পড়েছিল সেই শুকনো মানুষগুলো যেন ভিজে হাওয়ায় গলে যেতে লাগলো, বিশেষ করে যারা কিনারের দিকে

আশ্রয় নিয়েছিল। পর্দার আবরণ দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু বৃথাই। ঝড়বৃষ্টির দাপটে আর ঠাণ্ডায় মানুষগুলো কেঁপে কেঁপে সারা হতে লাগলো।

সেবা-কর্মীরা উদ্বিগ্ন।

যে বিরাট জনসমষ্টি এভাবে ভিজে গলে গলে যাচ্ছিল, তাদের সকলকে কম্বল দেওয়ার মত সামর্থ পূর্ববাংলা রিলিফ কমিটির ছিল না। তাই যে সমস্ত পরিবার তুলনায় বেশী জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, প্রয়োজন-বোধে শুধু তাদেরই একটা দুটো করে কম্বল তারা সরবরাহ করছিল। কমলাদেরও কমিটির কর্মীরা এই দলে ফেলেছিল। কিন্তু একটি কর্মী—কমলাকে একটা কম্বল তুলে দিতেই যেন সে গর্জে উঠল, 'না, না চাই না আপনাদের কম্বল।'

কথাটা তা'র কানেও পৌছালো, যার নাম সে জানে না। সে কাছেই ছিল, এগিয়ে এসে বললো, 'মানে? চাইনা মানে? এই শীতের মধ্যে মরবেন নাকি?'

'বেঁচে আছি নাকি?' কমলার ঝাঁঝালো উত্তর।

'দেখুন, ওসব বড় কথা, বেঁচে আছেন কি মরে আছেন তার মীমাংসা তো এখন করার সময় নয়। আপাতত তো ঠাণ্ডা সামলান—'

'না। বাঁচাতে পারেন আপনি? পারেন—?'

'না। বাঁচাতে পারি, এত বড় কথা বলতে পারি না। তবে—'

'তবে দরদ দেখাতে আসেন কেন আপনারা।' উত্তেজনায় আর কাঁপুনিতে কমলা যেন ভেংগে পড়লো।

দু'টো কম্বল রেখে অমিয়রা চলে গেল। যেতে যেতে অমিয় অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো।

অদ্ভুত!

কিন্তু সত্যই অমিয়র কিছু করার ছিল না। হাজার হাজার লোক যারা পূর্ব বাংলার ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এসেছে, এবং নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে প্রতিদিন আসছে, তাদের বাঁচানোর শক্তি তাঁর নেই, কোন মানুষেরই নেই। বাঁচানো কেন তাদের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার ক্ষমতাও নেই। কোন ব্যক্তি-বিশেষের নেই, ক্ষুদ্র কোন প্রতিষ্ঠানেরও নেই। তথাপি কিছু না-থাকার মধ্যেও যেটুকু আছে, তা-ই তো তারা দিতে চায়, আর চিরকালের মত এ সমস্যার সমাধান কোন পথে তার ইংগিত দিতে চায়। এইটুকু দেওয়ার মধ্যে তো তাদের কোন কার্পণ্য নেই।

তবু, কি আশ্চর্য এই মেয়েটি। জীবনের এমনি অবস্থায় মানুষ যেটুকু পায়, তা সামান্য হোক, তুচ্ছ হোক, হোক তা অপর্যাপ্ত, তাকেই তো মানুষ সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু, এই মেয়েটি! কেন গ্রহণ করলো না সে? সামান্য বলে, তা যথার্থ নয় বলে? না এটা ওর অহংকার? কারো কাছ থেকে কোন কিছু না নেওয়ার অহংকার? অমিয় আশ্চর্য হ'লো, এমনি অবস্থায়ও মানুষের অহংকার অবশিষ্ট থাকে?

হয়তো বা তা অহংকার নয়। কিন্তু তাহলে কার বিরুদ্ধে ওর এই আক্রোশ, চরম দুর্দশার মধ্যেও সাহায্যের যেচে-আসা অবদানকে নির্মম উপেক্ষা? এই আক্রোশ কি ব্যক্তিগত অমিয়র নিজের বিরুদ্ধে, তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, না সমস্ত ভোগবিলাসে লিপ্ত মানুষের বিরুদ্ধে, সমস্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে? আর উপেক্ষা করছে কাকে সে? সামান্য দানকে, না তার নিজের জীবনকে?

এমনি ধরণের নানা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরের ভেতর দিয়ে

অমিয় বুঝতে চেষ্টা করলো ওর মনকে। কিন্তু যে অন্তরঙ্গ সংযোগ থাকলে অপরের মনকে বোঝা সার্থক ও সত্য হয়, সেই সংযোগের অভাবে অমিয় কোন কিছুই সঠিকভাবে অনুমান করতে পারলো না। আসল কথা, এমনি ধরণের আচরণ সে আশা করেনি, বিশেষত একটি উদ্বাস্তু মেয়েব কাছ থেকে। সে আশ্চর্য হ'লো।

কিন্তু পরদিন নিবারণ সাহাদের কলোনীতে যাওয়াব পথে এই চিন্তাই অমিয়র মনকে সারাক্ষণ দখল করে রইল।

আর আর সব উদ্বাস্তুর মতই নিবারণ সাহারা ঘব বেঁধেছে। হাঁ, ঘব বেঁধেছে। বাঁশের বেড়া আর টালির ছাদ। ছোট্ট একটি ঘর। ওদের সংগে একে একে সমস্তগুলো ঘব দেখতে দেখতে অমিয় ওদের অতীত ও বর্তমানকে পরস্পরের সম্পর্ক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো। দুঃখিত হ'লো সে, কিন্তু আবার আশার চঞ্চল তরংগে উদ্বেলিতও হ'লো। কী বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরগুলো। কী বিরাট বিশ্বাসে আব আশায়! কে জানে এই ঘরের মানুষগুলোই একদিন ভারতবর্ষের আকৃতি বদলিয়ে দেবে। এই মানুষগুলোর সংগে কথা বলে বলে অমিয় মাটীর স্পর্শ অনুভব করে।

ফেরার পথে নিবারণ বলে, 'এই আমাদের সংসার।'

কি ছিল আর কি হয়েছে, সংগে সংগে মনে হয় অমিয়র। কিন্তু মনের এই আফসোস-ভরা চিন্তাকে মুখে প্রকাশ না করে অমিয় বললো, 'কি জানেন, এ দেশটা যেন শক্ত, বুকে যেন রস নেই।'

'রস নেই?—কি যে বলেন!'

'হ্যাঁ, রস নেই। আপনি জানেন না, কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে কতো জমি পড়ে আছে পতিত, কোন ফসল ফলে না।'

'ফসল ফলাতে জানে না বলুন!…রস নেই'—বলে নিবারণ হাসলো খানিকটা। তারপর বিড়িতে টান দিয়ে বললো, 'একটু সবুর করুন, এই বাঙালগুলোকে একটু বসতে দিন, তারপর দেখবেন এই শক্ত মাটিও ভেতরে কেমন রসাল। আসলে রস বের করতে জানতে হয়।'

সঙ্গের কে একজন বললো, 'আমরা জানি সে কায়দা।'

নিবারণ বলতে লাগলো, 'আমি জানিনা এই মাটি আমাদের গ্রহণ করবে কিনা, কিন্তু যদি সত্যই গ্রহণ করে তো দেখবেন আমরা দেশের উন্নতি বৈ ক্ষতি করবো না।'

নিবারণের ঘরের বারান্দায় একটা চাটাই-এ সবাই বসলো। নিবারণ সকলকে বিড়ি বিতরণ করলো। এটা সেটা আলাপ চলতে থাকার মধ্যে হঠাৎ নিবারণ বললো, 'ওঃ সেদিন আপনার সংগে আলাপ হয়ে কী ভালই হয়েছে, অমিয়বাবু!'

'কি রকম।' অমিয়র চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

'আপনার কথাতেই তো আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের সকলের নাম ধাম পেশা ইত্যাদি লিখে পাঠালাম। কাল দুজনের চাকুরী হয়েছে।'

'তাই নাকি? কোথায়?' আনন্দে অমিয়র চোখ দু'টো যেন চিক্‌চিক করে উঠলো। অকস্মাৎ নিজের প্রতি যেন মমতা হলো ওর।

'একজন দমদম এলাকায়, তাঁতের কাজ। আর একজন পোর্ট কমিশনারের অফিসে, সাধারণ কেরাণীগিরি।'

'কিন্তু আপনার?'

'আমার কথা ছেড়ে দিন।' নিবারণ মৃদু হাসলো।

সে হাসি টেনে অমিয় বললো, 'কেন, আপনাকে ছেড়ে দিতে হ'বে কেন। বেশ তো বুঝতে পারছি, তাল্গা টাকা নিয়ে আসেননি একছালা।'

'তবু চাকরি-বাকরি আমার পোষাবে না।'

'কেন? পেশা কি লিখেছেন?'

'চাষবাস।'

'তার মানে চাকুরি আপনি চান না, এই তো?'

নিবারণ হাসলো, নিজের অনিচ্ছাকে ঢাকাব চেষ্টা করলো না। বললো, 'না অমিয়বাবু, বড়মাহুষদের চোখ রাঙানি আমার সইবে না, ও পাববো না।'

'তবে?—'

'স্বাধীনভাবেই কিছু করবোটরবো ভাবছি। আর ভাবছি-ই বা কেন, মনে করুন আরম্ভ করেছি।'

'অর্থাৎ?'

'ফিরি করি, তোয়ালে গামছা গেঞ্জি কিছু কিছু ছিট কাপড় এসব।'

'চলবে?'

'চলবে মানে চালাতে হবে।' নিবারণ যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বাইরে থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় একরাশি চিন্তা ও ভাবনা কল্পনা তার মনের কোণে ভীড় জমাতে সুরু করেছে। সেই কল্পনার স্পর্শে সে তার বর্তমান থেকে সম্ভবত অতীতে অথবা সম্ভবত ভবিষ্যতে যাতায়াত করছে। কি রস সে আহরণ করছে কে বলবে? হয়তো নতুন কোন এক জায়গায় ঘর বাঁধতে সুরু করেছে।......

বছর দশেকের একটি ছেলে কাঁচের গেলাস ও কালাই করা কাপে কয়েকটা চা দিয়ে গেল। অমিয় অনুযোগের সুরে বললো, 'ওকি, ওসব আবার কেন ?'

নিবারণ তার উদাস-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিকে বর্তমানে ফিরিয়ে এনে বললো, 'নিন, এ সময়ে এক সংগে দুটো কথা বলেও আনন্দ আছে।'

'চা ছাড়া কি তা চলতো না ?'

নিবারণ হেসে বললো, 'চা-টা অন্তত আপনাকে আরো কয়েক মিনিট এখানে ধরে রাখবে।'

অমিয়র মনটা যেন গলে গেল। নিবারণের সাথীরা উৎফুল্ল আনন্দে হাসি-ভরা চোখে অমিয়র দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো নিবারণের জয় হয়েছে। হয়তো গৌরব বোধ করলো।

নিবারণ বলতে লাগলো, 'আসলে কি জানেন, আমার মনটা পড়ে আছে সেখানেই, যেখান থেকে বলতে পারেন পালিয়েই এসেছি একরকম।'

অমিয় যেন নিবারণকে খুঁচিয়ে দেখার অবকাশ পেলো। প্রশ্ন করলো, 'এলেন কেন ? দুই গভর্ণমেণ্টই তো আশা করছিল আপনারা সেখানেই থাকবেন।'

গভর্ণমেণ্টের নাম হতেই নিবারণ যেন জলে ওঠলো। কোন সুদূরে অজানার পারে ঘুরে বেড়ানো দৃষ্টি মুছে গিয়ে একটা অস্বাভাবিক কঠোরতা যেন ফুটে ওঠলো সেখানে। কাঠিন্যে শক্ত হয়ে গেল মুখ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব এলো, 'যেন গভর্ণমেণ্টের হিসেব মত মানুষের জীবন চলে! জানেন আপনি—' অকস্মাৎ চুপ করলো নিবারণ।

'কি ?'

'না থাক, ওসব বলে আর লাভ নেই। এসেছি, সবাই মিলে ফিরে যাব বলে। একদিন না একদিন যাবই।' একটুখানি চুপচাপ। তারপর বিড়িব ধোঁয়া ছেড়ে সে পুনরায় বলে, 'যে মুহূর্তে দেশ-বাড়ীর সীমানা পার হয়েছি, সে মুহূর্তে মনে মনে প্রণাম করেছি দেশের মাটীকে, আর প্রতিজ্ঞা করেছি, সে মাটিতে একদিন ফিরে বসবোই। যে মাটী আজ বিদায় দিয়েছে, সে মাটি আবার ডাকবেই আমাদের।'

'ডাকবে না কি মনে করেন ?'

অমিয়র মনটা ভরে ওঠে উৎসাহে। অভিনব শক্তি অনুভব করে সে। যদিও বহুদিন সে বাড়ীছাড়া দেশছাড়া, তথাপি সেই ভুলে-যাওয়া দেশের আকর্ষণ তাকে চঞ্চল করে। দেশের ভাঙ্গা চিত্রটা চোখের সম্মুখ থেকে সরে যায়, বিচ্ছেদেব লাইনটা আপনা থেকেই মুছে যায়; আর একটা অখণ্ড দেশ প্রতিভাত হ'তে থাকে। অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট রেখায় জল্ জল্ করতে থাকে। এই দেশ ডাকবে না কি কোন দিন ?

নিঃশব্দে চা খাওয়া হ'তে থাকে। এই নিঃশব্দ সান্নিধ্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা অনুভব করে এরা, যাকে কোন যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়নি, যা আপনা থেকেই এসেছে, যা সহজ। অমিয়র উদ্দেশ্য ও আসাটা সার্থক হয়েছে। সে জেনেছে একটা মানুষকে, একটা শক্তিকে। এই শক্তিকে তার প্রবাহের যথার্থ ধারা দেখিয়ে দিতে পারলে প্রকাণ্ড এক জলস্রোত সৃষ্টি হবে যা সমস্ত কৃত্রিম তীরগুলোকে অনায়াসে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এবং এই ভাংগার ভেতর দিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। এই

সম্ভাবনার চিন্তায় সে আনন্দিত হয়। নিবারণের শক্তিকে শ্রদ্ধা করে মনে মনে। তার ভবিষ্যৎ কর্মের একটা চিত্র ভাস্বর হ'য়ে ওঠে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে ওঠার উদ্যোগ করতে করতে অমিয় জিজ্ঞেস করলো, 'নতুন যে তিনটে পরিবার এসেছে, তারা ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

'দেখবেন, যেন নিজেদের ঐক্য না ভাংগে কোনদিন।'

'সে কথা আর বলতে! আমরা ভেবেছি আরও চার-পাঁচটা পরিবার বসিয়ে এ জায়গাটা একেবারে ভর্তি করে নেব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

'তাহলে আপনিও একটু দেখবেন। জানাশোনা লোক থাকলে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

সম্মতি জানিয়ে অমিয় ওঠলো। নিবারণরা কয়েকজন এগিয়ে দিয়ে গেল খানিকটা পথ। লোক বসানোর কথায় অমিয়র মনে হ'লো সেই উদ্বাস্তু মেয়েটির কথা। কিন্তু, অকস্মাৎ সে অনুভব করলো বিরাট বীতশ্রদ্ধা। কতকটা অবজ্ঞা আর কতকটা উপেক্ষায় ওর মনটা বিষাক্ত হয়ে গেল। মনে হলো, যেচে-আসা সাহায্যকে যে প্রত্যাখ্যান করে, কাজ কি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে? সমস্ত সেবা-প্রতিষ্ঠানেব বিরুদ্ধে অকারণ আক্রোশে যে গর্জে ওঠে, ক্ষমতা থাকে সে নিজেই নিজের পথ করে নিক্। অমিয় যাবে না তার অহমিকাকে খর্ব করতে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'লো, তবু তো সে উদ্বাস্তু মেয়ে!

এই উদ্বাস্তু মেয়েটি কিন্তু এদিকে পুড়ে মরছিল। লজ্জায় ঘৃণায় সে ঝড়বৃষ্টির ফেলে-যাওয়া কাদা-মাটির সংগে মিশে যেতে চাইছিল। অকারণে যে আক্রোশ সে প্রকাশ করেছে নাম-না-জানা মানুষটির প্রতি, তার দ্বিগুণ আক্রোশ এবার স্বয়ং তাকেই চেপে ধরলো। সমস্ত দেহ মনে একটা অপরিসীম জ্বালা অনুভব করতে লাগলো সে। কিন্তু কেন? কেন সে এমনি ধরণের ব্যবহার করলো সেই মানুষটির প্রতি, যার নাম সে জানে না অথচ দূর থেকে যার শান্তর সে স্পর্শ পেয়েছে। কোন উত্তর পেল না সে। কিন্তু মনে মনে সে স্থির করলো, যার সাহায্য সে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার কাছ থেকে কোন কিছু কখনো গ্রহণ করবে না আর। কেন না, এ যে তারই অপমান, তারই অমর্যাদা, যার নাম সে জানে না। লাঞ্ছনায় দুর্দশায় সে ডুবে যাক নিজে, ক্ষতি নেই, কিন্তু আর কোনমতেই অমর্যাদা করতে পারে না তাকে।

কমলা আশা করেনি যে সেই লোকটি আবার তার-ই সন্ধানে আসবে। কারণ, সে জানে, প্রত্যাখানের উত্তর তো অবজ্ঞা-উপেক্ষাই হয়! কিন্তু সত্য সত্যই যখন অমিয় এলো, তখন সে বিস্মিত হলো, শ্রদ্ধা করলো তার মহানুভবতাকে। কিন্তু ফিরিয়ে দিলো। অমিয় ওকে নিবারণ সাহাদের কলোনীতে যাওয়ার অনুরোধ করেছিল; সেখানে ঘর বাঁধা থেকে ওদের জীবিকার ব্যবস্থাপনা, চাকুরী সংগ্রহ ইত্যাদি সমস্ত কাজের দায়িত্ব নেবার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু শান্ত সংযত কণ্ঠে কমলা ফিরিয়ে দিলো সে আশ্বাসকে। সহস্র আত্মনিগ্রহের মধ্যেও সে আর অপমান করবে না কাউকে।

যাওয়ার সময় অমিয় বলে গেল, 'বেশ, যা ভাল মনে করেন, তাই করবেন। তবে যদি কখনো আপনার অভিমান দূর হয়,

তখন আমার খোঁজ করবেন, অথবা আমাদের কর্মীদের সংবাদ দেবেন, তাদের সব সময় এখানে পাবেন। আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব, তা আমরা সব সময়েই করতে প্রস্তুত।'

অমিয়র দৃঢ়পদক্ষেপের সংগে কমলার দৃষ্টি মিশে এক হ'য়ে গেল। বুক ভরে কান্না আসতে চাইল যেন। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করলো। তার চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা জীবন-নয় পরিবেশটার প্রতি তীব্র ঘৃণায় সে আঁৎকে ওঠলো। তার পাশেই শুয়ে-থাকা বসে-থাকা তার বাবামা ও ছোট ভাইগুলোর মৃত্যু কামনা করলো সে, হ্যাঁ মৃত্যু কামনা করলো। শুধু জীবনের অপ্রতিরোধ্য প্রেরণায় নিজেকেই বাঁচাতে চাইলো সে, শুধু নিজেকে।

কিন্তু বুঝতে পারলো না জীবনেতিহাসের কোন পর্যায়ে তার যাত্রা সুরু হ'লো। সে জীবন-নয় অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়েছিল, সুদৃঢ় একটা অবলম্বন সে চেয়েছিল, আর সে আশায়ই সে আবেদন করেছিল শক্তিতে উজ্জ্বল একটি মানুষেব কাছে, সে সাড়াও দিয়েছিল, কিন্তু কোন অব্যক্ত ও দুর্জ্ঞেয় প্রেরণায় সে ফিরিয়ে দিলো। গ্রহণ করলো না। মুক্তিলাভেব আশায় সে কোন অবলম্বন সৃষ্টি কবলো, তা কি জীবন, না জীবন-নয় পরিবেশেরই ক্রম-পবিণতি তা এইক্ষণে সে বুঝতে পারলো না, বুঝতে চাইলো না।

সন্ধ্যার মলিন আঁধার মিলিয়ে এলো শিয়ালদা স্টেশনে।

পাঁচ

ফোনে ত্রিদিব রায়কে আসতে অনুরোধ করে সুজাতা জীবনের ফেলে-আসা অধ্যায়গুলো পুনরায় পড়তে শুরু করে।

প্রথম যৌবনে পা দেবার পর ষোলটি বছর পার হয়ে গিয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কী-ই না ঘটেছে তার জীবনে, আর কী-ই না সে করেছে। এক কথায় এ সময়টাকে বলা যেতে পারে একটা উন্মত্ত বসন্ত। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন নতুন অনুভূতি ও নতুন নতুন উন্মাদনায় দিনের পর দিন সে ছুটে গিয়েছে বিচিত্র অভিসারে, বিচিত্র পথ বেয়ে। ওঃ কী অদ্ভুত লাগতো লেকের জলে ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলোকে, কী ভাল লাগতো মাঝরাতে নির্জন পথে ষাট মাইল স্পীডে মোটর চালানো, আর কী চমৎকার লাগতো পূর্ণিমা রাতে তাজমহলের মৌন সৌন্দর্য ও কলকাকলীকে! জীবন বলতে যা বোঝায় তা সবই ছিল ঐসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে, অপরূপ আবেগের মধ্যে, আর আগে-কোনদিন-ভোগ-না-করা অনুভূতির মধ্যে। এঁদের সমষ্টি ছিল তার জীবন, জীবনের অর্থ।

পুরুষের সংগে মেলামেশাও তার এমনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই। পুরুষের দেহ থেকে বেরোয় যে উত্তাপ, তা তাকে তাজা করে দিত, নাচিয়ে দিত তার রক্তকে। ওঃ কী যে ভাল লাগতো ওর! কী রোমাঞ্চকর আস্বাদন। এই আস্বাদনের লোভেই সে বহু পুরুষের দেহের সংগে নিজের দেহকে মিলিয়ে দিয়েছে, সার্থক মনে করেছে নিজেকে। দিন ভর আবেগে কেঁপেছে, শরীরের শিরায় শিরায় অনুতে অণুতে অনুভব করেছে এক অজানা আনন্দের

হিল্লোল। আহা! কী সুন্দর, কী মধুর কথা-কেড়ে-নেওয়া দিনগুলো!

জীবনের এই উন্মত্ত বসন্তের মধ্যে বহু পুরুষকে সে জেনেছে। তাদের মধ্যে এমনি অনেকে এসেছে যারা সামান্য স্পর্শেই তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ত্রিদিব রায়ের সংগে কি সত্য সত্যই সে বাড়াবাড়ি করেছিল? আবার এমন অনেকেও এসেছে যারা কোন-ভাবেই তাকে জাগাতে পারেনি, যেমন পঞ্চানন ঘোষ। সেজন্য কোন দিনই সে তাদের ক্ষমা ক'রতে পারেনি।

এমনি জীবনযাপনের মধ্যে সে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পায়নি, কোন সামাজিক বিধানকে মানার যুক্তি খুঁজে পায়নি। সে শুধু জীবনকেই পূজা করতে চেয়েছে, তার পরিপূর্ণ ভোগ ও সৃষ্টির মধ্যে। সামাজিক বিধান তাকে সে সুযোগ দিতে চায়নি, তাই সে তা অম্লানভাবে অগ্রাহ্য করেছে। বারবারই তার মনে হয়েছে, এইসব বিধানের গণ্ডীর মধ্যে তারাই বিচরণ করে যাদের মধ্যে জীবনের প্রেরণা নেই, সৃষ্টির প্রেরণা নেই, এক কথায় যারা নিতান্তই অক্ষম। অথবা অক্ষম না হয়েও যারা এসব মেনে চলে তারা স্রেফ নির্বোধ। অক্ষম বা নির্বোধ কোন দলেই সে পড়তে চায় না। সে তাদেরই দলে যারা নিজের জীবনের প্রেরণায় সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুরে এগিয়ে যায়, যারা চিরকালই ভাংগে যারা সেজন্য চিরকালই সমাজের ঊর্ধ্বে। তাই তথাকথিত নীতিবোধ তাকে কোনদিনই স্পর্শ করেনি।

বিয়েও সেইজন্যই সে করেনি।

মনের এই ভাবধারা বিনা আয়াসে সাথীত্ব পেয়েছিল ত্রিদিব রায়ের মনোভাবের মধ্যে। তাই আর সমস্ত পুরুষকে উপেক্ষা করে

ত্রিদিব এসেছিল তার মনের একান্ত কাছে। আহা! সেই কাছে থাকাথাকির দিনগুলো! কিন্তু, সেই কাছে থাকাথাকির দিনগুলোও তো অবসান হলো। সুজাতার মনে হলো, যেমনি সহজভাবে সে আর ত্রিদিব পরস্পরকে জেনেছিলো, তেমনি সহজভাবেই যেন সে জানাজানির হ'লো শেষ। কেন? সুজাতা অবাক হয়ে ভাবে। সে কি তাদেরই অপ্রতিরোধ্য জীবনবাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র দাবীর জন্য?

তাদের মহিলা সমিতিতে কত মেয়ে আসে কত মেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ নেয় তাদের মাধ্যমে। কিন্তু এদের কারো মধ্যে এই জীবনবাদের অভিব্যক্তি দেখতে পায় না সুজাতা। দুঃখ হয় তার। এরা কি জীবনকে ভোগও করতে চায় না, না এরা সকলেই অক্ষম? না, জীবন কি তাই বুঝতে পারে না এরা?

ভাবতে ভাবতে সুজাতা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় মুখ দেখলো। একটু পাউডার ঘসলো, একটু গন্ধদ্রব্য ছিটিয়ে দিলো। আবার মুখ দেখলো। কিন্তু আজ কি তাকে কুৎসিত দেখাচ্ছে? না, না, সে কিছুতেই কুৎসিত নয়, কুৎসিত হতে পারে না। গভীর শঙ্কায় মুখ ফিরিয়ে নিলো সে।

কিছুক্ষণ ধরেই ত্রিদিব রায় দরজায় দাঁড়িয়ে সুজাতাকে লক্ষ্য করছিলেন। এবার সুজাতা মুখ ফেরাতেই, চোখোচোখি হয়ে গেল। নিঃশব্দে ওরা পরস্পরের কাছে এগিয়ে এলো।

'কেন ডেকেছো?'

'এমনি।'

'এমনি? এমনি ডাকা তো অনেক কাল তুমি ছেড়ে দিয়েছো।'

'তাই তো আজ আবার ডাকলাম্।'

সুজাতার গলার স্বরটা যেন একটু কাঁপে। আবেগে। প্রথম যৌবনের উন্মত্ত বসন্তে ফিরে যেতে চায় সে। ত্রিদিবকে কি আজ আবার তেমনি করে পাওয়া যায় না? সে কি মরে গেছে? সুজাতা তার দেহের সমস্ত কিছু উপকরণ দিয়ে জাগাতে চায় ত্রিদিবকে, জাগতে চায় স্বয়ং। কেন জাগাতে পারবে না সে?

ত্রিদিব রায় একটা সোফায় বসে নীরবে সিগারেট টানতে লাগলেন এবং পলকহীন চোখে সুজাতাকে দেখতে লাগলেন, বুঝতে চেষ্টা করলেন কোন গোপন রহস্য আজকের ডাকের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। প্রকাশ্যে বললেন, 'ফাঁকি রেখে দাও সুজাতা, কেন ডেকেছো।'

'এমনি।'

'কেন? কি চাও বলো।'

'সেদিন পঞ্চাননদার বাড়ীতে তুমি কি চেয়েছিলে বলো।'

'আমি? কিচ্ছু না।'

'নিশ্চয়ই চেয়েছিলে, নইলে বন্ধুরূপে আমরা মিলতে পারলাম না কেন? বলতে পারো কেন?'

ত্রিদিব কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কি উত্তর দিবেন তিনি। তিনি জানেন জীবনকে নদীর স্রোতের মত করে। স্রোতের যাত্রাপথের বিভিন্ন ঘাটে বন্দরে কত খড়কুটোর সংগে পরিচয় হয়, তাদের সকলকে কি বুকে করে বয়ে নেওয়া যায়? ত্রিদিব রায় আর সুজাতা মুখার্জি—দুটো স্বতন্ত্র জলস্রোত অকস্মাৎ কোন এক স্থানে এসে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল; আবার, কিছুদূর একটি ধারারূপে চলার পর, সেই প্রবহমান ধারা দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র পথে বাঁক নিয়েছে। কেন বাঁক নিলো, কে কখন নিজেকে সরিয়ে নিলো সে বিচার আজ করে লাভ কি। স্রোতের ধর্মই তো

এই, সে বাঁক নেবেই। অধ্যাপক রায় বিস্মিত হয়ে ভাবেন, সুজাতা কি সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছে? সে কি গতি হারালো?

প্রকাশ্যে বললেন, 'পুরোনো সম্পর্কে কোথায় কি খুঁত ছিল, তাই ঘেঁটে আজ কি হবে বলো?'

'কিচ্ছু ঘাটতে চাইনে আমি, শুধু সেই সম্পর্কের মধ্যে দেখতে চাই।'

অধ্যাপক রায় চাপা হাসলেন।

'না, তুমি হেসোনা. সেদিন যে অবিচাব করেছো তুমি আমার উপর, আমাকে শুধু বুঝতে দাও যে তা তোমার মনের কথা নয়।'

ত্রিদিব রায় কোন কথা না বলে শুধু সিগারেট টানতে থাকেন। ঘরেব অস্বাভাবিক আবহাওয়াটা কোনক্রমেই দূর হ'তে চায় না। ত্রিদিব রায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উথপন করলেন, পূর্ব-পশ্চিম বাংলার অবস্থা আলোচনা করলেন, শিয়ালদা ষ্টেশনেব আশ্রয়শালার কথা ওঠলো, সহরের থিয়েটার সিনেমার প্রসঙ্গ থেকে অত্যন্ত মুখরোচক সামাজিক কুৎসাও আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু, কোন কিছুতেই কথা জমলো না, সুর ওঠলো না।

অপমানে উপেক্ষায় সুজাতা নিজেকে ঘৃণা করতে লাগলো। অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হোলো নিজেকে। পুরোনো সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সমস্ত চেষ্টাই কি তবে বৃথা? না জানি ত্রিদিবের চোখে কী অসম্ভব রকমের ছোট দেখাচ্ছে তাকে! রূপ রস গন্ধের বাইরের প্রলেপ দিয়ে জীবনে বসন্ত ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার মধ্যে না জানি কী হীনতা লুকিয়ে আছে। মনে হ'লো, ত্রিদিবের চোখে মুখে কী নির্লজ্জ উপহাস, কী সুতীব্র বিদ্রূপ!

ইচ্ছে হ'লো এই মুহূর্তে সে ত্রিদিবকে ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে বলে। কিন্তু পারলো না। নিজের অক্ষমতায় নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হ'লো সে। ডেকে আনা অতিথিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলো না।

ত্রিদিব রায়ের সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের ফ্যানের বাতাসের সংগে মিলিয়ে যেতে লাগলো। অবলম্বনহীন সময় তালহীন ভাবে কাটতে লাগলো। নিজেকে কোন মতেই এই অবস্থার যোগ্য করে তুলতে পারলো না সুজাতা, শুধু ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলো যেন। কিন্তু তবু অপেক্ষা করতে লাগলো। ত্রিদিব কি বদলাবে না ?

অধ্যাপক রায় সুজাতার সাম্প্রতিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন, 'কেন তোমার সেবা-কর্ম ? তাতে—'

'আমাকে অপমান করো না ত্রিদিব।'

'না না, অপমান নয়, আমি সত্যি বলছি তাতে আনন্দ পাও না তুমি ? বেশ তো উৎসাহের সংগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে।'

'কিন্তু জীবন ! তাকে কি সমস্ত কর্মের মধ্যেও ভোলা যায়, রায় ?'

ভোলা যায় না, ত্রিদিব তা জানেন। তাই তো তিনি নিজেকে ঠকান না অন্তত। জীবনকে ভোগের মধ্যে, নবতর অভিজ্ঞতার আস্বাদনের মধ্যে পেয়ে পরিতৃপ্ত হন তিনি। তাই এই সীমার বাইরে তার গতিবিধি নেই। লোক-দেখানো পরোপকারে তার স্পৃহা নেই। নিজের সত্তার আনুকূল্য যেখানে নেই, সেখানে তিনি অনুপস্থিত। এদিক থেকে তাঁর জীবনদর্শন অত্যন্ত সরল, সোজা। তাই সুজাতাকে কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাই করলেন না তিনি।

হঠাৎ সুজাতা উঠলো, চঞ্চল ভীত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো ত্রিদিবের দিকে। তাঁর হাত দুটোকে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরবার চেষ্টা করলো, আর আবেগ-কাতর কণ্ঠে ডাকলো 'ত্রিদিব—'।

অধ্যাপক রায় তাঁর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিলেন, একটু সরিয়েও নিলেন নিজেকে। চোখে চোখে মিললো। কোথাও কোন জ্যোতি নেই, আলো নেই। যেন তাদের দু'জনের মিলিত বসন্ত কবে কোন কালে পুড়ে ছাই হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আজকে উভয়ের ফিকে দৃষ্টিতে তার চিহ্নমাত্রও নেই। করুণা-ভরা হাসির কথা ফুটে উঠলো রায়ের ঠোঁটে, তিনি ওঠে দাঁড়ালেন।

যেন আহত হয়ে সুজাতা ছিটকে পড়লো একটা সোফায়। সে চোখ বুজলো, যেন অপমানটা চোখে দেখলে সইতে পারবে না সে। কিন্তু অনুভব করলো অধ্যাপক রায়ের চলে যাওয়ার শব্দ।

একটু কাঁদলোও না সে।

কয়েকদিন আগে ডাঃ শচীশ সেন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়কে যা বলেছিলেন তাই সত্য হ'লো; অর্থাৎ, পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে যেসব উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থী আসছে তাদের সামলানোর জন্য প্যাটেল অথবা নেহরু কেউ আসেন নি। আর তাদের সামলানোর মত ক্ষমতা যে পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্টের নেই, এ কথাটা কেউ না বলে দিলেও ডাঃ সেন বুঝতে পারেন। হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে শত শত রোগীকে পরীক্ষা করে ডাঃ সেন যখন ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে বিকেলে বাড়ী ফেরেন, তখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন সমস্যার ব্যাপকতা, এবং মানুষের বাঁচার সমস্যার তীব্রতা। এই ব্যাপকতা ও তীব্রতার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যে কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর তা নিজের কর্ম দিয়েই তিনি বুঝতে পারেন। ক্লান্ত মনে তিনি ভাবতে

থাকেন এ ছাড়া অন্য কি ভাবে সমস্যার বিচর করা সম্ভব হ'তো। অন্য কি উপায়ে এর সমাধান হতে পারতো!

বলা বাহুল্য, কোন স্পষ্টতর সিদ্ধান্তে তিনি পৌছাতে পারেন না। কিন্তু নিজেকে তিনি কোন দিন ফাঁকি দেন নি। অতীতেও নয়, বর্তমানেও নয়। ধনী পরিবারে জন্ম তাঁর, কিন্তু ডাক্তারী পড়ার সময় থেকে কি ভাবে যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছেন, সেই থেকে সেই সংযোগ কখনো তিনি ত্যাগ করেন নি। বরং ত্যাগই করে এসেছেন সর্বতোভাবে। যৌবনে যে আদর্শবাদ গ্রহণ করেছিলেন, তা খণ্ডিত হতে পারে মনে করে তিনি বিয়ে করেন নি। এখনো অবিবাহিত। তার অর্থের প্রয়োজন ছিল না, তাই পিতৃপুরুষদের সঞ্চিত অর্থ দান করেছেন কংগ্রেস আন্দোলনে আর আর্তের সেবায়। আর সেই প্রেরণায়ই দরিদ্র রোগীর কাছ থেকে কখনো তিনি ফি গ্রহণ করেন নি। সে আদর্শ তাঁর আজ পর্যন্তও সমান উজ্জ্বল।

কিন্তু নিজেকে এমনি ভাবে বঞ্চিত করেও, যে বিচক্ষণতা থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করা যায় অথবা যে কুরবুদ্ধি থাকলে উপদলীয় চক্রান্তের মধ্যমণি হয়ে বসা যায়, তার অভাব থাকায় ডাঃ সেন এমন কোন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি অথবা কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও এমন কোন প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নি যাকে হিংসা করা চলে বা যাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা চলে। টাকা দিয়ে আধুনিককালে মানুষ কেনা চলে, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখছেন, কিন্তু এই পন্থায় নিজেকে ধনধান্য গরিমায় প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা তাঁর কাছে অভাবনীয়। তাই যেখানে বর্তমানে কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের মধ্যে কিছু হওয়ার আগ্রহ নিতান্ত বলবান, সেখানে তিনি

তাঁর আদর্শকে জীবনে সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। বিত্তশালী পরিবারের লোক বলে অনেকে তাঁকে ভুল বোঝে, বুঝুক ; ভুল বোঝা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি নিজে জানত খাঁটি, তাই মানুষের ভুল বুঝাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন।

কিন্তু নিজের আদর্শ বলিষ্ঠ হ'লেও এবং কোন কর্মেই কোন ভাবে ফাঁকি না দিলেও ডাঃ সেন যেন আর আগের মত শক্তি পাচ্ছেন না। তিনি জানেন কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করে তাঁদের এককালীন একনিষ্ঠতাকে কালিমায় লেপে দিয়েছে। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, একবার বি-পি-সি সির বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং যে সব ব্যক্তি তাতে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করায় তিনি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সমস্ত চক্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। উপ-দলীয় কোন্দল থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাও তাঁর সেজন্যই কোন মহল থেকেই সমর্থিত হয় নি। তাঁর সহকর্মীদের অসাধুতা ও দুর্নীতিই কি তাঁর নিজের শক্তিহীনতার মূলে !

আর তাঁর নিজের বিশ্বাস যে, গভর্ণমেণ্ট ভুল করে চলেছেন। হয়তো যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না কিন্তু তিনি জানেন যে, তাঁর কথা সত্য। তার প্রমাণ তিনি পান প্রতিদিনকার কর্মকোলাহলের মধ্যে সাধারণ মানুষের গা জ্বালানো মন্তব্যের মধ্যে। এমন কি, যারা তাঁর নিকট অষুধ পত্রের প্রার্থনা করতে আসে, এবং ফি না দিয়ে শরীর পরীক্ষা করিয়ে যায়, তারাও শেষ পর্যন্ত নাক সিটকিয়ে মুখ বিকৃতি করে চলে যায়। লোকগুলোকে চাবকে দিতে ইচ্ছে হয় সময় সময়। কিন্তু আবার মনে হয়, এরা তো প্রত্যক্ষ কর্ম দিয়েই বিচার করছে কংগ্রেসের, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের !

অথচ এমনিভাবে কংগ্রেস শক্তিহীন হ'য়ে পড়ছে বলেই অন্যান্য কংগ্রেসবিরোধী দলগুলো মানুষকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি এদের দলগত নীতি বুঝেন না, কিন্তু শ্রদ্ধা করেন এদের সব কর্মীদের। অতীতে এরা যখন কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করতো, তখনও তিনি দেখেছেন, কী অসাধারণ অধ্যবসায় এদের কর্মীর; আর কী সীমা-হীন সহনশীলতা। জেলখানায়ও খুব ঘনিষ্ঠভাবে এদের দেখার সুযোগ হয়েছিল তার। সেখানেও এদের মাধুর্যময় ব্যবহারে চমৎকৃত হয়েছেন। আর এই সংকটেও দুর্গত আর্তের সেবার মাধ্যমে নতুন করে এদের পরিচয় পাচ্ছেন। ওঃ পূর্ববাংলা রিলিফ কমিটীর কর্মী-গুলো! কী পরিশ্রমটাই না ওরা করে!

এমনি অনেক কথা ভাবতে ভাবতেই ডাঃ সেন পায়চারী করছিলেন তাঁর বৈঠকখানায়। চানটান হয়ে গিয়েছে, সকালবেলার জলযোগও সমাপ্ত। ডাক্তারী বাক্স ইত্যাদি চাকরটা ইতিমধ্যেই গাড়ীতে তুলে দিয়েছে। এখন বেরুলে কখন যে ফিরবেন তার স্থিরতা নেই, তাই যেন বের হওয়ার আগে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন।

চাকরটা অনেকগুলো খবরের কাগজ টেবিলে রাখলো দেখে ডাঃ সেন চেয়ারে বসলেন এবং অত্যন্ত দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন। কী একটা সংবাদ গভীর মনোযোগের সংগে পড়লেন, তারপর হঠাৎ কি ভেবে পুনরায় পায়চারি করতে লাগলেন। এক সময় হাত-ঘড়িটা দেখলেন এবং সিগারেট ধরালেন। সিগারেটটা শেষ হ'লেই বেরিয়ে পড়বেন এমনি সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু এমন সময় দরজা ঠেলে যে প্রবেশ করলো তাকে দেখে ডাঃ সেনের সেই মুহূর্তেই ঘর থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হতে লাগলো।

স্তম্ভিত হলেন তিনি। কারণ, সুজাতা মুখার্জির আগমন তিনি

কোনদিনই প্রত্যাশা করেন নি। আর এখানে সে আসেও কালে ভদ্রে, আর প্রত্যেক বারই রবাহুত ভাবে। সুজাতাকে তিনি কোনকালেই পছন্দ করেন নি; তার জীবনের বহু ঘটনাই তাঁর কাছে জলের মত স্বচ্ছ, আর একান্ত ভোগের দেহ-সর্বস্ব জীবন-যাপনের আদর্শ কোনদিনই তাঁর বুদ্ধিকে আঘাত করেনি। অথচ এই সুজাতাই নানাভাবে কংগ্রেসের নানা কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে একরকম অপরিহার্য করে তুলেছে নিজেকে।

ডাঃ সেন চেষ্টা করেও যেন কোন কথা বলতে পারছিলেন না।

কিন্তু সুজাতাই বললো, 'ওঃ এখনো বেরোন নি। আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে পাবই না।'

'কেন, কি ব্যাপার বলো তো?'

'না, ব্যাপার কিছু নয়। এদিকে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছা হলো একটু খোঁজ নিয়ে যাই।' সুজাতা হাসলো, এবং হাসতে থাকলো।

ডাঃ সেন এই সরল কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, কেননা সুজাতাকে তিনি জানেন। নেহাৎ কৌতূহল বশে সে তাঁকে দর্শন দেবে সে জাতের মেয়েই সে নয়। তাই, তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব, তিনি গভীরভাবে সুজাতাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, মনের কোন জায়গায় গোপন মতলব লুকানো রয়েছে, তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন।

সুজাতা নিজেকে গোপন রাখাই স্থির করলো। বরং বলা যায়, একটা সন্দেহের আবরণের মধ্যে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো। কারণ, তার নিজেরই স্পষ্ট কোন ধারণা নেই, কেন আজ এ সময়ে সে এখানে এসে হাজির হয়েছে। কি চায় সে? আসলে সত্যই কি সে কিছু চায়? সুজাতা এসব প্রশ্নের উত্তর নিজের মনেও খুঁজে

পায় না। প্রশ্নগুলোই যেন সেখানে অনুপস্থিত। মনে ধরেছে এসেছে, ব্যস্। এর বেশী সে কিছু বুঝতে পারে না।

কিন্তু তার চোখদুটো সংবাদপত্রের উপর বিচরণ করলেও ডাঃ সেন যে রীতিমত বিব্রত বোধ করছেন, তা বুঝতে সুজাতার কোন অসুবিধা হ'লো না। ডাঃ সেন তাকে ভাল চোখে দেখেননি কোনদিন, হয়তো দেখেন না এখনো। এমনি একজন লোকের কাছে নিজেকে ধরে দিয়ে সুজাতা কৌতুক বোধ করতে লাগলো।

ডাঃ সেন কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সুজাতার মন বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি সহানুভূতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলেন। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে ভেসে বেড়ানো সুজাতার জীবনেও কোন দুঃখের, হাহাকারের সুর বেজে ওঠে নাকি! দুঃখের আঘাতে সেও কাঁদে নাকি! কিন্তু কথাটা মনে হ'তেই ডাঃ সেন এটাকে উড়িয়ে দিলেন। দূর! তাও কি হ'তে পারে? সুজাতা সম্পর্কে এ যে কল্পনাতীত। আর কেউ ভাংতে পারে, সে ভাংগতে পারে না। কারণ, সে যে সুজাতা।

কিন্তু সুজাতাকে দরদ দিয়ে বুঝতে গিয়ে ডাঃ সেনের দরদ হ'লো নিজেরই প্রতি। ভাবানুভূতি ও হৃদয়াবেগের চোখে তিনি দেখতে চাইলেন নিজেকে। তাঁর নিজের জীবনেও কি কোন ব্যর্থতা ও না-পাওয়ার বেদনা সংগোপনে অনুরণিত হয়ে ওঠে? মন কি ভিজে কখনো? ডাঃ সেন এবার নিশ্চিন্তে হাসলেন। বাইরের কর্ম দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত সত্তাকে এমন ভাবে ভরে রেখেছেন যে, হৃদয়ের দুর্বলতা তাকে ঠেলে বাইরে আসতে পারে না। নিজের সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু তা হ'লে সুজাতা কেন এখানে, সুজাতা? তাঁকে জাগিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা রাখে নাকি সে? ফুঃ! সে ক্ষমতা নেই সুজাতার। ডাঃ সেন শক্তি অনুভব করেন মনে।

কিন্তু সুজাতাকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে কি সমবেদনা দিয়ে কোনভাবেই বুঝতে পারছেন না। তার এখানে আসার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। ব্যর্থ হয়ে বললেন, 'দেখো, আমি সরল রেখায় চলি; অতশত বুঝিনা। খোলাখুলি করে বলো তো কি চাও তুমি?'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলো সুজাতা। ডাঃ সেনের কঠিন স্বরে যেন ভীত হ'লো সে। অনেকটা আমতা আমতা করে বললো, 'শচীশ দা, সত্যি কিছু চাইনে আমি।'

'তাহ'লে?'

সুজাতা সত্যই বিপদে পড়লো। কি উত্তর দেবে সে? সে নিজেই কি জানে কেন এসেছে সে এখানে। চাওয়া? কি চাইবার আছে ডাঃ সেনের কাছে, রস-ভারাক্রান্ত করে যে কোনদিন জীবনের দিকে তাকালো না? ত্রিদিবের কাছে যে আঘাত সে পেয়েছে তাকে প্রলেপ দিতে চায় সে? কখ্খনো নয়। আর সে ক্ষমতাও নেই ডাঃ শচীশ সেনের। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, তাঁর সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন-আঁকা চোখ দুটো। তাদের বোঝাবে সে কি দিয়ে।

অবশেষে মিথ্যারই আশ্রয় নিলো সে।

বললো, 'ধরমচাঁদ শেঠিয়ার আজ আমাদের এক হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিলো। তাই এসেছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। অথচ—'

'খুব দরকারী, না?'

সুজাতা কোন কথা বললো না। মিথ্যাটা বেশীদূর এগিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। সংবাদপত্রে মন দিলো সে, এবং সম্ভবত ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

ডাঃ সেন আশ্বস্ত হ'লেন, কিন্তু কোন কথা না বলে ভেতর বাড়ীর

দিকে বেরিয়ে গেলেন। দু'এক মিনিট চুপচাপ থেকে সুজাতা বসবে কি উঠবে ঠিক করতে পারছিলো না, এমন সময় ডাঃ সেন পুনরায় প্রবেশ করলেন, এবং টেবিলে দশখানা একশটাকার নোট রেখে বললেন, 'এই নাও।'

সুজাতার মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়লো। কী যে একটা ঘটে গেল তার কোন অর্থ, তার কোন ইংগিত কিছুই সে বুঝতে পারলো না। বিস্ময়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল; এই ধরণের আক্রমণ সে ডাঃ সেনের কাছ থেকে আশা করেনি। অথচ, এই মুহূর্তে, যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাঃ সেনের এই যুক্তিহীন কার্যের প্রতিবাদ করা উচিত, তখন সে অনুভব করলো কে যেন তার কথা বলার শক্তি হরণ করে নিয়েছে। কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে, একটি শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারছে না। শুধু ফ্যাকাশে দৃষ্টি নিয়ে সে তাকাতে চেষ্টা করলো ডাঃ সেনের দিকে। কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে তার মনে হ'লো না। মনে হ'লো যেন ডাঃ সেনের মূর্তিটাও ক্রমশ তার দৃষ্টি থেকে সরে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে।

সত্যসত্যই ডাঃ সেন সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। সুজাতার আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁর এমনিতেই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল। সে প্রসঙ্গ এমনিভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ায় তিনি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। যাবার আগে একটু থেমে বলে গেলেন, 'তা ভাই আমি চললাম, তুমি তো বাড়ীর সবাইকেই চেনো, চা খেয়ে যেও, কেমন?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বিবশ ভাবটা কাটতে সুজাতার একটু সময় লাগলো। সম্পূর্ণ

সচেতন হয়ে সে আর ডাঃ সেনকে ঘরে দেখতে পেল না। নোট-গুলোকে চোখের সামনে দেখে শুধু তার মনে হ'তে লাগলো, এ কোন আবর্তে সে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। শেষে ডাঃ শচীশ সেনের মত লোকও তাকে পদদলিত করে চলে গেল?…সুজাতা ওঠলো। কিন্তু—

কিন্তু সত্যই কি এ অপমান, না সহানুভূতি?

ছয়

শিল্পী সংঘ পূর্ববাংলার আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য একটি গীত-নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-গাঁথা, সংগীত ও নৃত্যকে অবলম্বন করে শিল্পীরা ফেলে-আসা এবং প্রায়-ভুলে-যাওয়া সাংস্কৃতিক সম্পদকে কলকাতার পাথরে-গড়া সাংস্কৃতিক পরিবেশে পুনরুজ্জীবিত করে তুলছিল। আর এই লোক-শিল্পের সংগে ওরা সংযোজিত করেছিল রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের ভাবসম্পদকে। শ্রীরঙ্গম্-এর সম্ভ্রান্ত স্টেজ পূর্ববাংলার সবুজ মাঠের পাখীর কাকলীতে মুখর হ'য়ে ওঠলো পাথর প্রাণ পেল যেন।

এই অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে অরুণা দত্ত। সংগীতের মূর্ছনায় আর নৃত্যের হিল্লোলে সে এক অপূর্ব স্পন্দন অনুভব করছে নিজের মধ্যে। তার দেহের সমস্ত অনুপরমাণু যেন আজ অকস্মাৎ তাজা হয়ে ওঠেছে। এমনি অনুভূতি, এমনি আনন্দ জীবনে আর কখনো সে অনুভব করেছে বলে মনে হচ্ছে না তার। এর আগে অসংখ্য সঙ্গীতে-নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছে, অনেক সৌখিন অভিনয়ে পাঠ করেছে, কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পীদের সাথীরূপে নৃত্য করেছে, কিন্তু আজকের আনন্দের মত আনন্দ যেন কোনদিন সে পায়নি, আজকের চাঞ্চল্যের মত ভাব-তরঙ্গে কোন-দিন সে অবগাহন করেনি। নৃত্য ও সংগীতের এক একটা পর্ব শেষ হ'তেই শত শত দর্শকের সমবেত করতালি তার বুকের মধ্যে কিসের সুর যেন বাজিয়ে দেয়, দেহের উত্তাপ যেন হাজার গুণ বেড়ে যায়। সে আশ্চর্য হয়; কোথা থেকে এলো এতো আনন্দ!

তার মনে হয়, এমনি ভাবে কোন দিন কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে, কোন নৃত্য বা সঙ্গীতের মধ্যে যেন সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি। বিলিয়ে দেয়নি কোনদিন আজকের মত করে। তার সমস্ত সত্তা আজকের গানের মধ্যে, আজকের নৃত্যের মধ্যে, আজকের ঐক্য-তানের মধ্যে মিশে এক হয়ে গেছে। সে-ই যেন গান হয়ে সুর হয়ে নৃত্য হয়ে ফুটে ওঠেছে শ্রীরঙ্গমের স্টেজে। মনে মনে সে ভাবে, কিসের স্পর্শ অনুভব করলো সে আজ? কার আকর্ষণে সে আজ এমনি অদ্ভুতভাবে গানের সুরের সংগে এক করে মিশিয়ে দিলো? বুঝতে পারে না সে। কিন্তু এটা বুঝতে পারে যে; আজকের একটা মুহূর্ত যেন জীবনের আর সব কিছুকে ক্ষুদ্র করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আজকের এই মুহূর্তের বাঁচা যেন তার পূর্বেকার শিল্পী জীবনের সমস্ত সার্থকতাকে ম্লান করে দিয়েছে।

নিজের মধ্যে সৃষ্টির স্পন্দন অনুভব করে সে। এমনি করে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েই সম্ভবত সৃষ্টি করতে হয় নতুনকে। এই সৃষ্টির আহ্বানেই হয়তো শ্রীরঙ্গমের আবহাওয়া চঞ্চল হয়ে ওঠেছে, আর তার হৃদয়কে করেছে উদ্বেলিত। সৃষ্টি-কর্ম কি এতই মধুর? দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে ওরা যে নতুনকে সৃষ্টি করতে চায়, তার স্বরূপও কি এমনি মধুর, তার আগমনও কি হ'বে এমনিভাবে নৃত্যের ছন্দে ঘোষিত? আহা-হা, এমনি উদ্দীপনার মধ্যেই যদি সে কাটাতে পারে সারাটা জীবন! এমনি আনন্দ-স্রোতের মধ্যে!

অনুষ্ঠানের একটা পর্ব শেষ হ'তে অরুণা স্টেজ থেকে দ্রুত গ্রীণ-রুমের দিকে যাচ্ছিল। পথে ওর দিদি অণিমা দাঁড়িয়ে। অরুণা আবেগ সামলাতে না পেরে দিদিকে জড়িয়ে ধরলো।

যেন পিশে মেরে ফেলবে। অনিমা হেসে হেসে বললো, 'ও কি ও?'

'ওঃ এমনি আনন্দ যে কোনদিন পাইনি রে দিদি। কী অদ্ভুত লাগছে আজ আমার, কী অদ্ভুত!'

অনিমা ওর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'তোর সমস্ত দেহ আজ সে কথা ঘোষণা করেছে, তুই নতুন।' দিদিকে ছেড়ে অরুণা ছুটে পালাল গ্রীণ-রুমে।

পরবর্তী পর্যায়ের ডাক পড়লো। অর্কেষ্ট্রা বাজতে আরম্ভ করেছে, কী উন্মাদনা তাতে! অরুণারা প্রবেশ করতেই বিপুল হাততালি হ'লো। আজ যেন কোন শ্রান্তি নেই, কোন ক্লান্তি নেই অরুণার। কোন শ্লথ পদ-বিক্ষেপ সেই। সবই সতেজ, সজীব, সবুজ। ওরই আকর্ষণে যেন সে নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে, এই ঢেলে-দেওয়ার যেন অবসাদ নেই, কোন কালিমা নেই। দেবার প্রেরণা জেগেছে তার মধ্যে, সে দিতে চায়, শুধু দিতে চায়, শুধু সৃষ্টি করতে চায়, নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিলিয়ে দিতে চায়। সারাটা রাত, সারাটা জীবন যেন ভরে দিতে চায় এই প্রেরণায়। তাই যখন এক একটা পর্ব শেষ হয়ে যায়, যেন তার মনে হয়, কী অল্প সময়ের মধ্যই যেন ওটা শেষ হ'য়ে গেল। আক্ষেপ হয় কেন আরও কিছুক্ষণ ধরে তা চললো না।

অনুষ্ঠানের শেষ হবে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ও অরুণার একক নৃত্যে। সমবেত কণ্ঠে কালের মন্দিরা বেজে ওঠেছে। কাল অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে, এই বয়ে-চলার মধ্যে হাঁ-না'র দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই যেন কাল চলে। অরুণা নৃত্যের মূর্ছনায় বুঝতে পারে যেন হাঁ-না'র কলহ তার জীবনে এইমাত্র শেষ হয়ে গেল। না আর সেখানে নেই, আছে শুধু হাঁ। এই হাঁ দিয়েই

সে সৃষ্টি করছে, সৃষ্টি করছে নতুনকে। সৃষ্টির আহ্বান জানায় সে সকলকে।

সমবেত কণ্ঠে তখন গান চলেছে

তালে তালে সাঁঝ সকালে
রূপ সাগরের ঢেউ লাগে
সাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান রঙ্ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধেনে
কান্না হাসির তাল সেধেনে ;
ডাক দিলো শোন মরণ বাঁচন
নাচন সভার ডংকাতে।
নিত্য নূতন সংঘাতে ॥

কালের চলাব পদে পদে মরণ বাঁচনের খেলা। পদে পদে। অরুণাব মনে হয়, চলার এই খানে এই মুহূর্তে অর্থাৎ বর্তমানের এই পর্যায় মৃত্যু যেন মুঠায় মুঠায় ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। আর এই মৃত্যুব বিরুদ্ধেই মানুষ বাঁচার সংগ্রাম করছে। অরুণা এই বাঁচার প্রেরণাকেই নাচের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে—বর্তমানের মৃত্যু থেকে ভবিষ্যতের বাঁচনের মধ্যে আশ্রয় লাভের ইংগিত জানাচ্ছে। কী উদ্দাম কী প্রাণবন্ত এই জানানোর কাজ! কথায়, সুরে, নৃত্যে এই ডাক মূর্ত হয়ে ওঠেছে, শিরায় শিরায় জাগছে যেন নতুনের আহ্বান।

তুমুল হাততালির মধ্যে ড্রপ পড়লো।

কিন্তু উৎসব তখনো শেষ হয়নি। আবর ড্রপ ওঠলো। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ডাঃ মেঘনাথ সাহা। তিনি এই অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী সংঘকে ধন্যবাদ জানালেন, এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ঘোষণা

করলেন যে, শিল্পী সংঘ এই অনুষ্ঠানের বাবদ তাদের সমস্ত খরচ পত্রাদি বাদ দিয়ে দেড় হাজার টাকা দান করেছেন পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটিকে। হাততালি পড়লো।

তারপর সামান্য কয়েকটি কথায় তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বললেন, পূর্ব বাংলায় লোক-জীবনের এই যে অমূল্য সম্পদ শিল্পীরা চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তা তিনি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তিনি কেন, সংস্কৃতির উপাসকরাও সে দিকে নজর দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আর বর্তমানে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর আড়াল করে দিয়েছে। তাই শিল্পীদের নিকট সকলে কৃতজ্ঞ যে তারা কলকাতার বুকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অনুভব করছেন, যেন দেশের ডাক পৌঁছেছে তাঁর হৃদয়ে; সেই ডাক যদি সবাই অনুভব করে তো খণ্ডিত বাংলা পুনরায় সংযুক্ত হ'বে; সেই অখণ্ড বাংলায় লোক-জীবনের সমস্ত সাংস্কৃতিক সম্পদ নব সৃষ্টির প্রেরণায় জেগে ওঠবে পুনরায়, দেশ হাসির প্লাবনে ভাসবে।.......

হাততালি হ'লো, ড্রপ পড়লো।

এদিকে অরুণাকে ঘিরে রীতিমত কোলাহল ও জটলা বেঁধেছে। সবাই নিয়ে এসেছে অভিনন্দনের বাণী, কেউবা অকৃত্রিম ভালবাসা, কেউবা শুধুমাত্র দেখার সুযোগের আশায় ঠেলাঠেলি করছে। পরিচিত বন্ধুদের সংগে হেসে কথা কইলো সে, কোন বান্ধবীর সংগে গলাগলি করলো। অত্যন্ত আনন্দিত হ'লো সে। নিজের সাফল্যে কৃতার্থ বোধ করলো সে।

অণিমা মেয়েদের ভীড় কমানো চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। কল্যাণ তাদের পত্রিকার জন্যে ফটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো কিন্তু সবচেয়ে অশ্চর্য লাগলো অরুণার ত্রিদিব বাবুকে। তিনি

ওকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন, ওদের কলেজের অধ্যাপক ত্রিদিব রায়, যিনি অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর একখানা টিকিট কিনেছিলেন, অনেকটা যেন ওকে কৃতার্থ করার জন্যই। অরুণা যেন বিজয়ের গৌরব অনুভব করলো।

শত শত দিনের ওজন দিয়েও আজকের মত একটি দিনের পরিমাপ করা যায় না; শত শত দিনের আনন্দ দিয়েও আজকের আনন্দকে জানা যায় না। জীবনের শত সহস্র স্বপ্ন আশা আর উদ্দীপনা একটি মাত্র দিনের কয়েকটি ঘণ্টায় পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। যেন আজকেই তার জন্ম হ'লো, আজই যেন সে প্রথম বুঝতে পারলো তার মধ্যে প্রাণ আছে, প্রেরণা আছে যা সৃষ্টি করতে চায় আগামী কালকে।

আহা-হা, জীবনের সব কটা দিনই যদি আজকের দিনের মত রঙীন হ'তো, আজকের দিনের মত সত্য হ'তো!

শো'র শেষে ফেরার পথে বিজয় অমিয়কে বলছিল, 'তুই কি?—'

'কেন বল দিকি?'

'বউটার দিকে একটু নজর টজর দিস্। ওযে একেবারে মলিন হয়ে যাচ্ছে দিনদিন, দেখছিস না!'

'ওঃ, ওসব তোরা দেখিস। আমি পারবোটারবো না।'

বিজয় হেসে বললো, 'গাধা কোথাকার! বউকে আদর করার জন্য বাইরের লোক আনতে হ'বে, না?'

শান্তি অভিকে নিয়ে ট্রামের মহিলাদের আসনে বসেছিল। তাই দুই বন্ধুর পক্ষে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে। অমিয় সত্যই ভেবে পায় না কোথায় ওর অসম্পূর্ণতা। সারাদিন রাজনৈতিক

কর্ম ও আর্ত-সেবায় ব্যস্ত থেকে রাত্রিদিন কোন বেলাতেই নির্দিষ্ট সময়ে তার বাড়ীফেরা এবং খাওয়া হ'য়ে ওঠে না। বাড়ী ফেরেও বা যখন তখন তাড়াহুড়া করে খানিকটা জল ঢেলে দেয় শরীরে, আর রাক্ষুসের মত ভাত গিলে। বিশ্রাম করে, বিছানায় গড়াগড়ি যায়, অভিকে নিয়ে হৈ-চৈ করে খানিকটা, তারপর আবার বেরিয়ে যায়, নয়তো কখন ঘুম এসে তার চোখ বুজিয়ে দেয় বুঝতে পারে না। নিঃসাড়ে পড়ে ঘুমায়, আর ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে যায়। কী এক অজানা প্রেরণায় কাজ করে যায়। দিনের পর দিন।

অমিয় বুঝতে পারে না, এর থেকে বেশী বা অতিরিক্ত সে আর কি করতে পারতো, বা এর মধ্যে কোথায় শূন্যতা। শান্তি, অভি, সে আর তার বাইরের কর্ম-জীবন,—এর সব কিছু নিয়েই তো সে এক, সে পূর্ণ। এর মধ্যে যে কোথাও ফাঁক থাকতে পারে, তা যেন সে কল্পনাও করতে পারে না। তা'হলে শান্তি সাথে সাথে অভিযোগ করে কেন? মাঝে মাঝে অসম্ভব রকমের মলিন দেখায় কেন তাকে? অমিয় কি আদর সোহাগে ভালবাসায় কৃপণ? সে খুঁজে পায় না কোন উত্তর, বুঝতে পারে না নিজের মনকে।

তবে, সত্যই এটা ঠিক যে শান্তির কাছে এলেই যেন তার সমস্ত সংকোচ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সে ভীষণ আশ্চর্য হয়। ঘরের সীমানার বাইরে তার যে জীবন, সেখানে তার যে শংকা বা সংকোচ আছে একথা কেউ কোনদিন বলতে পারেনি, পারবেও না। সেখানে সে বেপরোয়া। গ্রামে গ্রামে, বস্তিতে বস্তিতে, বাড়ীতে বাড়ীতে সে ঘুরে বেড়িয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। সর্বত্র তার দ্বার উন্মুক্ত। বাড়ীর বৃদ্ধ অভিভাবক থেকে আরম্ভ করে অন্দর মহলের ঠাকুমা ঠানদি পর্যন্ত সমস্ত মহলে তার অবাধ গতিবিধি। কথায় আর

ব্যবহারের চমৎকারিত্বে সে ভুলিয়ে রাখে সকলকে, অকৃপণ স্নেহ-প্রীতি সে কেড়ে ভোগ করে। কিন্তু তার সবকিছু বেপরোয়াপণা এবং কথার ফুলঝুরি যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে যায় শান্তির কাছে এলেই। কোথায় যে পালিয়ে বেড়ায় তার কথার ঝর্ণাধারা, আর কোথায় বা পালিয়ে যায় তার স্নেহ-প্রীতি কেড়ে ভোগ করার প্রেরণা। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে শান্তির নিঃসঙ্গ সখীত্বে। কেমন যেন অবাক লাগে।

শান্তিকে কি ভালবাসে না সে? নিজেকে প্রশ্ন করে সে। কিন্তু উত্তরে তেমনি পাল্টা এক প্রশ্নই করে, কোন সন্দেহ আছে তাতে? সত্যি কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই সেখানে। শান্তিকে সে ভালবাসে, সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসে। তার জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম, প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন ঘিরে রয়েছে শান্তি, যেন তার নিজেরই অঙ্গের গেঞ্জির মত। তাই কি সে শান্তিকে বাইরে দেখতে পায় না। ভেতরের জিনিষকে বাইরে টেনে আনতেই কি তার এতো সংকোচ? আর সেজন্যই বুঝি সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না! কাকে সে প্রকাশ করবে, আর কার কাছে? নিজের কাছে কি নিজেকে প্রকাশ করার মত কিছু আছে? অমিয় বুঝতে পারে না।

বললো, 'ব্যাপারখানা কি বল দেখি।'

'আমি কি করে বলবো ব্যাপার কি? তোদের ব্যাপার—' বিজয় বল্লে।

'তাহ'লে?'

'মনে হয় ও সুখী হতে পারছে না।'

'কি করে পারবে বল, গরীব রাজনৈতিক কর্মীর বৌ; কোন আশাই তো তার পূরণ হ'বে না।'

'তা ঠিক তা নয়।'

'তবে ?'

'ঐ তবে-তেই তো মুস্কিল।'

'কি জানি, বাবা, অত সূক্ষ্ম জিনিস বোঝার ক্ষমতা নেই আমার সাদাসিধা কথা থাকে তো বলো।'

বিজয় হাসে। কি বলবে সে ?

সুযোগ বুঝে অমিয় কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়। আজকের শো'তে কতখানি কাজ হয়েছে, ওদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা কতখানি বেড়েছে, গণ্যমান্য শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে কারা কারা এসেছিলেন, ইত্যাদি বিপুল উৎসাহের সংগে আলোচনা করতে থাকে। বিজয়ের মনে হয়, এ যেন এক নতুন মানুষ কথা বলছে। এক মিনিট আগে সামান্য যে ভাবান্তর অমিয়র মধ্যে দেখা দিয়েছিল, নিমেষে তা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, কোনদিন যেন একে আর দেখা যাবে না। কথায় কথায় উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ এসে গেল, এবং পুনর্বাসন সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যায় তা পরিণতি লাভ করলো। অমিয়কে আর পায় কে। একটানা কথার স্রোতে যেন ডুবে যায় সব। কে বলবে মানুষের জীবনে একান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বলে একটা পদার্থ থাকতে পারে ? কে বলবে ব্যক্তিগত জীবন বলেও একটা জিনিস আছে ?

এর অধিকাংশ কথাই বিজয়ের কানে গেল না। মনে মনে হাসতে লাগলো সে, এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো নিস্পৃহভাবে। ভাবলো, কাকে বলছিল সে শান্তির হৃদয়ের কথা !

শিয়ালদায় এসে শান্তি একরকম জোর করেই বিজয়কে ট্রাম থেকে নামিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। শান্তি বললো, 'আজ অরুণা সত্যিই তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে, আমি এতটা আশাই করিনি।'

'সত্যি, আজ যেন কেমন inspired হয়ে গিয়েছিল।' বিজয় বললো।

'সত্যি, কী চমৎকার!'

'আচ্ছা, বৌদি, তোমার ইচ্ছে করে না এমনি করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।'

'আমার? —' দীর্ঘশ্বাস ফেললো শান্তি। 'আমার আবার ইচ্ছে, থাকলেই বা কি।'

দীর্ঘশ্বাসটা অমিয় অনুভব করছিল। হাসিতে অনুযোগ মিশিয়ে সে বললো, 'এই আরম্ভ হ'লো ন্যাকামো।'

'তুই চুপ করনা, বাপু।' বিজয় ধমক দিলো।

অমিয় অভিকে নিয়ে পড়লো। 'কে ভালরে অভি, মা না অরুণা পিসী?'

'অলুনা পিসী।'

'মা মরে যাইরে অভি?' শান্তি প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, অভি ঘাড় নেড়ে জানালো।

বিজয় আর অমিয় হাসলো। শান্তিও হাসলো, কিন্তু হাসির সংগে মিললো অশ্রু। অকস্মাৎ যেন অমিয় অত্যন্ত ভাল লাগলো শান্তিকে। বিজয় ধমক দিয়ে বললো, 'এই তোমাদের দোষ বৌদি, হাসি-ঠাট্টাও বুঝতে পার না?'

'ঠাট্টা কেন হবে ঠাকুরপো, কথাটা যে সত্যি।'

অমিয় বললো, 'নাও নাও হয়েছে; ন্যাকামো রেখে খেতেটেতে দাও দেখি।' চোখ মুছতে মুছতে শান্তি বেরিয়ে গেল। বিজয় বললো, 'ওকে বাইরের কোন কাজে engaged রাখা যায় না রে?'

'ভাবছি, কিন্তু কি করবে বল দেখি?'

সত্যি, কি করতে পারবে শান্তি, বিজয় ভাবে।

খানিক বাদে বারান্দা থেকে ডাক এলো, 'অভি, বাবুকে আসতে বল।' বারান্দায় পৌঁছে সমস্ত পরিবেশটা নিরীক্ষণ করে অমিয় বললো, 'দু থালায় কেন?'

'বাঃ খাবে দুজনায় তো ক'খানা থালা দিতে হবে?' শান্তি হাসলো। গম্ভীরভাবে অমিয় বললো, 'হাসি রাখো, আরেকটা থালা নিয়ে এস এবং সমান তিনভাগে ভাগ কর।'

শান্তি নির্বিকার, শুধু নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

'তাহ'লে বিজয়কে না খেয়েই বাড়ি ফিরতে হয়, কি বলিস?'

'হুঁ।' বিজয় সংক্ষেপে উত্তর দিলো।

শান্তির সমস্ত প্রতিবাদ ভাংগে এই আক্রমণে, এবং আরেকখানা থালা এনে নীরবে ভাত সাজাতে লাগলো নতুন করে।

বিজয় ভাবতে লাগলো, বাইরে থেকে অমিয়কে যতটা কঠিন ও হৃদয়হীন বলে মনে হয়, আসলে তো তা নয়। ঠিক এই মুহূর্তে যেন ওর বাইরের শুষ্ক আবরণটা খুলে পড়ে গিয়েছে, আর তার পশ্চাতে লুকানো প্রীতিরস ভালবাসায় তাজা একটি মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই তাজা মনের উত্তাপ কি শান্তির হৃদয়কে স্পর্শ করে না? স্পর্শ না করে কি পাবে? তা'হলে? এর মধ্যেও শান্তিকে এতো মলিন দেখায় কেন? বিজয় বুঝতে চেষ্টা করে, খেতে খেতে শান্তির পানে তাকায়। কিন্তু সেখানে ম্লান হাসি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না সে। ভাবতে থাকে।

খাওয়া দাওয়া সেরে বিজয়ের চলে যাওয়ার পর অমিয় বাইরের দরজার সিঁড়িতে বসে বিড়ি টানতে লাগলো। অভি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তি গুছিয়ে রাখছে ঘরকন্নার সব জিনিসপত্র। কলকাতার

পথঘাট নির্জন হতে আরম্ভ করেছে, কোলাহল স্তিমিত হয়ে গেছে রাস্তার ছুপাশের উঁচু বাড়ীর ফাঁকে একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে বেশ নির্মল। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবে দেখতে পাচ্ছে সে চাঁদে ছড়িয়ে পড়া আলোকে। নীচে পড়ে আছে একটুখানি মাটি, অবশ্য যদি তাকে মাটি বলা চলে, কালো মাটি।

শান্তি নিঃশব্দে দরজায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো।

অমিয় ভাবতে লাগলো কি করে সে জয় করবে তার সংকোচকে নিজেরই কাছে নিজের সংকোচকে। কিন্তু কি হাস্যাস্পদ মনে হ কাজটাকে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না; হয়তো ছুজনে ছুজনের নিভৃত মনের চিন্তাকে জানার চেষ্টা করলো; হয়তো জানতে চাইলো একের মনে আরেকজন জাগ্রত আছে কি না।

অবশেষে শান্তিই কথা বললো প্রথমে, 'আচ্ছা একটা কথা বলবো উত্তর দেবে?

'বলো।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করে সুখী নও, না?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সে বললো, 'ঐ, ঐ, মাথায় পোক গুলো বুঝি নাচতে আরম্ভ করেছে আবার!'

'না, সত্যি বলো না।'

'আচ্ছা' আমি একটা প্রশ্ন করি, উত্তর দেবে?'

'বলো।'

'তোমার মাথা কি সত্যই খারাপ?'

আবছা আলোর মাঝেও অমিয়র মুখের হাসি দেখতে পেল শান্তি। কি জানি কেন, তার নিজেরও হাসি পেল, আর মনে হ'লো কি বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছিল সে। বুঝতে পারলে

অমিয়র চোখ দুটো তার চোখের সংগে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছে। কেন যেন ভীষণ লজ্জা হ'লো শান্তির।

অমিয় চোখ ফিরিয়ে নিলো। একবার আকাশ, একবার মাটির দিকে তাকালো সে। ভাবতে লাগলো, এই একটুখানি মাটির সংগে একটুখানি আকাশের মিলন কি করে সম্ভব হবে!

সেদিন ছিল কল্যাণের ছুটির দিন। আজকের দিনটা নিরঙ্কুশ আড্ডা দিয়ে কাটাবো এই তার সঙ্কল্প।

কিন্তু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে পারছে না। বিলম্ব হ'তে লাগলো নানাভাবে। সেদিনকার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন কাগজ কি লিখেছে তা জানার আগ্রহ প্রবল ছিল কল্যাণের। বিভিন্ন পত্রে তা বেরিয়েও ছিল; কিন্তু, দুঃখের কথা, একদিনে বেরোয়নি। এই হ'লো অসুবিধা। আজ ছুটির দিনে সে স্থির করেছিল সমস্ত কাগজ থেকে কাটিং কেটে ফাইলে এঁটে রাখবে। সে কাজেই দেরী হতে লাগলো।

কাগজ থেকে নির্দ্দিষ্ট অংশটা কেটে নেওয়ার আগে পুনরায় সে অংশটা পড়ে নেয় কল্যাণ। গর্বে বুকটা যেন ভরে ওঠে। একটি পত্রিকা লিখেছে, শিল্পী সংঘের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে ভবিষ্যৎ গীতি-নাট্যের নতুন সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। আর সে সম্ভাবনাকে একমাত্র অরুণা দত্তর মত শিল্পীরাই বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। ......আরেকখানা পত্রিকা লিখেছে, শিল্পীরা লোক-জীবনের যে সুর ও ছন্দকে আমাদের সম্মুখে সজীব করে তুলেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলা কতো ঐশ্বর্যময় এক সংস্কৃতির

অধিকারী।.........আরও একখানা কাগজ মন্তব্য করেছে, কি সংগীতে, কি নৃত্যে শ্রীমতী অরুণা দত্ত প্রমাণ করেছেন যে তাঁর প্রতিভা কত উঁচু দরের। ..একটা একটা করে আঁটতে লাগলো কল্যাণ। বড় আনন্দ হ'তে লাগলো ওর। গুন্‌গুন্ করে আপনা থেকেই যেন আনন্দটা গান হয়ে ফুটে উঠছে।

কেন যেন অকস্মাৎ মনে হয়-কল্যাণের যে, সময় পুনরায় চলতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন আগেও যে তার মনে হয়েছিল যে সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সময়ের সে নিথর স্তব্ধতা যেন আর নেই। যেন সুব বেজে উঠেছে। সে আশ্চর্য হয়, কে বাজালো এই সুর? কে? পূর্ব বাংলার আশ্রয়প্রার্থীরা যে যে স্থানে ঘর বাঁধতে আরম্ভ করেছে তার প্রায় সমস্ত জায়গায়ই সে ঘুরেছে, এবং তাদেব জীবনের বর্তমান ও অতীতকে সম্পর্কিত করে মোহময় করুণ চিত্রও সে এঁকেছে তাদের সংবাদপত্রের স্তম্ভে আর তা দেশময় পরিবেশন করেছে। তাদের নব-অনুভূত ভাবতরঙ্গ আব ঘর-বাঁধার প্রেরণার মধ্যেই কি আবিষ্কার করেছে সময়ের চলার ছন্দ; না, অনুভব করেছে শিল্পী সংঘের রসঘন অভিব্যক্তিতে? ফাইলে কাগজ আঁটতে আঁটতে সে ভাবে।· কল্যাণদের কাগজে অরুণার একটা ছবি বেরিয়েছিল, ওর নিজেরই তোলা। সেটা কাটার আগে ভাল করে কল্যাণ একবার দেখে নিলো, তারপর কাঁচি চালালো।

সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষও যেন হঠাৎ কেমন উদার হয়ে গেছে বলে ওর মনে হয়। নইলে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে সব ইংগিতপূর্ণ নিবন্ধ সে লিখেছে, এবং যেগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, অন্য সময় হ'লে তা কখনো পত্রিকায় স্থান পেত না। এ কি মানবতার স্বীকৃতিতে, না অন্য কিছুর গরজে। আর ক'দিনই বা এই উদারতা বেঁচে থাকবে?

যদি থাকে। কল্যাণের কেমন ভাবতে ভাল লাগে, যদি থাকে। কেন না, ভিন্ন ভিন্ন কলোনী আর মফঃস্বলে ছড়িয়ে-পড়া উদ্বাস্তু-গ্রাম থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছে, বর্তমানের সংকটময় আবর্তে পাক-খাওয়া বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জীবনের যে পরিচয় সে পেয়েছে, তাকে নিজের মত করে রূপ দিতে চায় সে, তার ভেতরের মূল সুরটাকে সমস্ত লোকের কানে পৌঁছে দিতে চায়। কিন্তু সে জানে তা অসম্ভব। কারণ, আজ যেটুকু স্বাধীনতা সে ভোগ করছে, ক'দিন বাদেই সে স্বাধীনতাটুকু ফিরিয়ে নেবেন কর্তৃপক্ষ। কোন উদ্বাস্তুর চোখের জল কর্তৃপক্ষের হৃদয় গলাবে না। তা যেমন আপনা থেকেই প্রয়োজনে গলে, তেমনি প্রয়োজনে শুকিয়ে যায়।······

এ নিয়ে কল্যাণের মেসের লোকজনের সংগে ওর কত তর্ক-বিতর্ক হয়, ওরা যেন কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। না বুঝুক, কল্যাণের অত মাথা ব্যথা নেই। মন ওর ভরে উঠেছে, স্ফূর্তিতে আনন্দে। সময় চলতে আরম্ভ করেছে, সে বুঝতে পারছে। তাতে আর ভুল নেই, একটুও যেন ভুল নেই।

কাটিং-এর ফাইলটা সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। কিন্তু দেখা হ'ল অনিমার সংগে। অনিমা তখন ওদের বৈঠকখানা ঘরে বসে ওদের দলীয় একটা পত্রিকা এবং দু'টো পুস্তিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। টেবিলে কয়েকটা দৈনিক ছড়ানো।

কল্যাণকে প্রবেশ করতে দেখেই অনিমা জিজ্ঞেস করলো, 'এই অবেলায়?'

'আজ আমার off-day.'

'ওঃ তাই বলো।···আচ্ছা তোমরা তো খুব ফলাও করে আজ-কাল শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি ছাপছো—'

কল্যাণ প্রতিবাদ করে বললো, 'শুধু আমরা কেন, সবাই ছাপছে।'

'ব্যাপারখানা কি বলো তো, অকস্মাৎ—'

'এতে আবার অকস্মাৎ কি পেলে'। পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের দুঃখে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন—ছেড়েই রাতারাতি বেঙ্গলি হিরো'তে পরিণত হয়েছেন। খবরের কাগজওয়ালারা জনসাধারণের সংগে মিলেমিশে hero worship করছেন। আবার যখন জওহরলাল শ্যামাপ্রসাদকে ধমকাতে থাকবেন, তখন খবরের কাগজওয়ালারাও শ্যামাপ্রসাদকে ধমকাতে থাকবেন। এ তো বরাবর যা হয়, তা-ই হচ্ছে।'

কল্যাণের কথার ধরণ দেখে অনিমা হাসতে লাগলো। বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয়, ডাঃ মুখার্জি ইচ্ছে করলে গভর্ণমেণ্টকে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিতে পারেন এবার।'

'হুঁ। ইচ্ছে করলে—'

'আসলে ইচ্ছে করবে না, এই যা মুস্কিল।'

'হুঁ'। আসলে ইচ্ছে করবে না, এই যা মুস্কিল।' কল্যাণ অনিমার কথার প্রতিধ্বনি করলো মাত্র, উত্তাপহীন আবেগহীনভাবে।

'অথচ দেখো কতো বড় সুযোগ সামনে; তাঁর ব্যক্তিত্ব আছে, শক্তি আছে, দেশটাও গরম, এমনি অবস্থায় কী না করা যেতে পারে।'

'আসলে কি জানো, ওঁদের রাজনীতির ধরণটা স্বতন্ত্র। ওঁরা শুধু দাবী ঘোষণা করতে জানেন, কিন্তু দাবী আদায়ের জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত, তা কোনদিনই গ্রহণ করেন না।'

'অর্থাৎ?' অনিমার প্রশ্ন।

'অর্থাৎ, এই দেখো না, দেশময় তো বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খুব জোড়ালো ভাষায় গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করছেন, মানুষগুলোকেও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু যে constructive plan থাকলে সংগ্রামে নামা যায়, তা কি ওঁর আছে, না সে নিয়ে তিনি ভাবেন! এর কোন চিহ্নই নেই।' কল্যাণ থামলো, এবং একটা সিগারেট ধরালো।

'সত্যিই তাই, কি যে অদ্ভুত!'

তারপর আলোচনা ক্রমশ তর্কবিতর্কে পরিণত হয়। বর্ত্তমান পরিবেশের মধ্যেও, পাক-ভারত সম্পর্কের আমূলে পরিবর্তন না করেও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কি করা সম্ভব ছিল, এবং গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী কার্যক্রমের দ্বারা শ্যামাপ্রসাদের পক্ষেও কি আদায় করা সম্ভব, কল্যাণ তা বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু অনিমা বুঝবে না কিছুতেই। ওর রাজনৈতিক কূটতর্কের ক্ষমতা কম নয়। কল্যাণ যা সম্ভব বলে বোঝাতে চাইছে, অনিমা পাল্টা বোঝাতে চাইছে যে, তা অসম্ভব। এই দুই দৃষ্টিকোণকে মেলানো সম্ভব হচ্ছে না, সম্ভব হচ্ছে না আরও এই কারণে যে কল্যাণ যতটা না নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল তার চেয়ে বেশী চেষ্টা করছিল ডাঃ মুখার্জির দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠিত করার। তাতে গণ্ডগোল আরও পেকেই গেল।

কল্যাণ মনে মনে তারিফ করছিল অনিমার।

অনিমা শেষটায় যেন চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করলো, 'বেশ তো, না হয় বুঝলাম পাকিস্তানের সংগে ঝগড়াঝাঁটি করে অনেকটা জায়গা আদায় করলে, কিন্তু স্থায়ী ফল হ'লো কি তাতে? ভাগা-ভাগিটা তো থেকেই গেল—'

'তা তো গেলই।'

'তা হ'লে? ভাগাভাগি রেখে মানুষের জীবনের উন্নতি করতে চাও?'

কল্যাণ কোন উত্তর দিলো না।

'আমি তো তাই বলতে চাই ভাগাভাগিটাকেই বানচাল করতে হ'বে।'

'এ নিয়ে তো কারো বিরোধ নেই।' কল্যাণ জানালো।

'তা হলে এতক্ষণ কি সব আজেবাজে বকছিলে,' বলে অনিমা হাসলো। কথাবার্তার ফাঁকেই একবার অনিমা বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল তা এবার বোঝা গেল; ঠাকুর দু-কাপ চা আর দুটো পরটা নিয়ে এলো। কল্যাণ আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, পরটা দেখে সিগারেট রেখে পরটায় মন দিলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে কল্যাণ হেসে অনিমার মুখের দিকে তাকালো।

'কি হ'লো?' অনিমার প্রশ্ন।

'বলবো?' তারপর একটু আস্তে বললো, 'কিন্তু মনে করবে না তো যে তোমার প্রেমে পড়েছি?' কল্যাণের মুখে হাসি।

অনিমাও একটু জোরেই হেসে ওঠলো। এবং হাসতে হাসতেই বললো, 'তুমি পড়লেও কিন্তু আমি পড়ছি না।'

'তা হ'লে বলি। সারাক্ষণ তো নিজেকে বাইরের কাজে ডুবিয়ে রেখেছো, এর মধ্যে কোন ফাঁকে কি মনে হয় না তোমার যে এ ছাড়াও আরেকটা জীবন আছে, যা শুধু মাত্র একলার?'

অনিমার হাসি মিলিয়ে গেল। গাম্ভীর্যের নিষ্প্রভ আলো যেন নেমে এল সেখানে। সত্যি, এ সমস্যাটাকে সে কখনো তলিয়ে দেখেনি। কিন্তু কোন মতামত দেওয়ার আগে সে নিজের মনটাকে

যাচাই করে দেখতে চায়। তাই বৈঠকখানা ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও পাইচারি করার চেষ্টা করলো সে, আর ভাবতে লাগলো।

কল্যাণ নীরবে সিগারেট টানতে লাগলো।

কোন সুসংহত চিন্তা আসছে না যেন মাথায়। কেমন যেন এলোমেলো অসম্বৃত টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবধারা ও কথা। কিন্তু এই অবিন্যস্ত ভাবগুচ্ছকে ঠেলে একটা মাত্র কথা ও ভাব যেন নিজেকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। সে ভাল করে বুঝতে পারছে না, অথবা সত্য বলে গ্রহণও করতে পারছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে তার মনের গোপন স্নেহপ্রীতিরস যেন বিশেষ একটা কোণে সঞ্চিত হ'তে আরম্ভ করেছে, হ্যাঁ বিশেষ এক কেন্দ্রে। কিন্তু সেখানে পাচ্ছে কি সে? অনিমা ভেবে দেখতে লাগলো। শুধু কি মানুষকে দেখছে? তার সৌন্দর্যকে, তার পৌরুষকে? না, কথাটা তো সত্য নয়। তাব মনে হচ্ছে, তার কর্ম, চিন্তা, ভাবনা-কল্পনা, স্নেহ প্রীতি ভালবাসা ইত্যাদি সমস্ত কিছু মিলিয়ে সে এক, সে সম্পূর্ণ। তার এই সম্পূর্ণ সত্তা কি মিলতে পারে কোন অসম্পূর্ণ সত্তায়। অনিমা ঘাড় নাড়লো, না, তা হয় না, তা অসম্ভব। আব্‌ছা অস্পষ্ট চিন্তার পর্দা ঠেলে সে সেই কেন্দ্রেও দেখতে পাচ্ছে যেন আদর্শ, কর্ম ও ভালবাসায় মেশানো এক পূর্ণ সত্তাকে। না, কোন ভুল চুক নেই। আর হ্যাঁ, সে উত্তর পেয়েছে, যা সে খুঁজেছিলো।

বললো, 'তোমার প্রশ্নেব উত্তর পেয়েছি কল্যাণ। শোন, তুমি যাকে একলার জীবন বলেছো, আমি তাকে আমার আর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে পারছি না, এ যেন আমার আর সব

কিছুর সংগে মিলেমিশে থাকা একটা অংগ। যদি বলো ভালবাসার—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি তাই জানতে চেয়েছি।' কল্যাণের চোখে দুষ্ট হাসি।

'জানিনা কাউকে ভালবাসি কিনা অথবা ভবিষ্যতে বাসবো কি না, কিন্তু সেখানেও সব কিছু মিলিয়ে যার মধ্যে নিজেকে পাব—'

'ধরো যদি তার সংগে আদর্শের মিল না হয়।'

'তাহ'লে মনেরও মিল হ'বে না।' অনিমা চূড়ান্তভাবে বললো।

এরপর আর কোন প্রশ্ন চলে না। কল্যাণ ভাবতে লাগলো। মানুষের মনের বিচিত্র গতির সংবাদ খুব বেশী সে রাখে না, কিন্তু সব সময় কি সহজ সরল রেখায় মন চলে? আমার আদর্শই আমার জীবন, আদর্শই আমার মন, এমন দ্বিধাহীন অবিচল উক্তি কি অনিমা জোর করে করতে পারে? বিস্মিত হয় কল্যাণ।

'এবার তোমার কথাটাও বলো।' অনিমা দাবী জানালো।

'আমার?—এমন তো কথা ছিলো না।' কল্যাণ হাসলো।

'আমাকে প্রশ্ন করার অধিকারই বা তোমাকে কে দিয়েছিলো, শুনি,' হাসতে হাসতে অনিমা উত্তর দিলো।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন' বলে কল্যাণ যেন একটু বেশী চাঞ্চল্য আর উদ্বেগ মিশিয়ে প্রশ্ন করলো 'অরুণা কোথায়, অরুণা?' এতক্ষণে অনিমারও খেয়াল হ'লো যে, এর মধ্যে অরুণা একবারও বৈঠকখানায় এসে দর্শন দেয়নি।

অরুণা শো'র পরের দিনই অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়নি। কিন্তু না যাওয়াটা একেবারেই অসৌজন্যতা ও অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে মনে করে সেদিন সকাল বেলায় গিয়ে হাজির হলো অধ্যাপক রায়ের বাসভবনে। দিনটা ওদেরও সকলের ছুটির দিন।

অরুণা পৌঁছতেই অধ্যাপক হৈ-হল্লা বাধিয়ে বসলেন। স্ত্রীকে ডেকে আনলেন, স্ত্রীর সংগে সংগে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও হুড়োপুটি করে এসে হাজির হলো। অধ্যাপক রায় স্ত্রীর সংগে অরুণার পরিচয় দেওয়ার পর অধ্যাপকপত্নী বললেন, 'সেদিন ভাই তোমাদের কি একটা শো হয়েছিল, তারপর থেকে ইনি তোমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। আমার তো ভাই কান ঝালাপালা হয়ে যাবার যো হয়েছে।'

অরুণা বুঝতে পারলো, যেন ওর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। সে মাথা নীচু করে হাসতে লাগল নিঃশব্দে।

কিন্তু মাথা নীচু করেই সে শুনতে পেল অধ্যাপক রায় স্ত্রীকে বলছেন, 'অত তাকিয়ে দেখছো কি?'

'কি তাতো তুমি জান?'

'জানো ও আমাদের ছাত্রী?'

'সেইজন্যেই তো আমার আরও বেশী ভয়।' স্ত্রী উত্তর দিলেন।

'যাও যাও অত ভাবনা ভাবতে হ'বে না তোমার, একটু জলযোগের ব্যবস্থা করগে, এতো বড় একজন শিল্পী আমাদের সম্মুখে—' অধ্যাপক রায়ের গলার আওয়াজে ঘরের আবহাওয়া যেন স্ফূর্তিতে কাঁপে। তিনি সশব্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন।

'তুমি পালিয়ে যেও না ভাই, এক্ষুনি আসছি' বলে অধ্যাপক-পত্নী নিষ্ক্রান্ত হ'লেন। দু'একটি ছেলেমেয়েও মাকে অনুসরণ করলো।

কিন্তু অরুণা বুঝতে পারলো না এঁদের কথার ইংগিত। অধ্যাপক-পত্নীর কথায় কিসের যেন একটা আভাস ছিল। সেটা কি, অরুণা একরাশ ভেবেও ঠিক বুঝতে পারলো না। অধ্যাপক রায়কে সে যতদূর জানে, এবং ছাত্রীদের মধ্যে তার সম্পর্কে যে আলোচনা তাতে এইটুকুও সে আন্দাজ করেছিলো যে, তাঁর কতকগুলো বদ্ধমূল আইডিয়া আছে, যেগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে তিনি অনুসরণ করেন; এবং একটা জীবন-দর্শন আছে, যেটা শুধু বাঁচার আনন্দের জন্যেই বাঁচতে চায়। এর বেশী কিছু অধ্যাপক রায় সম্পর্কে সে জানেনা, শোনেনি। মেয়েদের রূপ সম্পর্কেও তাঁর মনে একটা নির্দিষ্ট ধারণা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তারই কি কোন ইংগিত ছিল অধ্যাপক-পত্নীর উক্তিতে? অরুণা অনুসন্ধান করে মনে মনে।

'সত্যি, অরুণা, সেদিন তুমি যা করেছ, তা চমৎকার, অনবদ্য। আমিতো ভাবতেই পাবিনি যে এতটা পারবে তোমরা।'

অরুণা বুঝতে পারলো না তার কোন উত্তর দেওয়া উচিত কিনা, তাই সে চুপ করে রইলো। কিন্তু তাদের অধ্যাপকের মুখ থেকে এই প্রশংসাটা শুনে সে উজ্জ্বল না হ'য়ে পারলো না।

'কিন্তু এটা আমি সত্যি ভেবে পাইনা, তোমাদের মত শিল্পীরা কিভাবে নিজেদের নষ্ট করছে, কেন করছে।'

নষ্ট করছে কথাটায় যেন একটা ভীষণ ধাক্কা লাগলো অরুণার মনে। সে মুখ তুলে তাকালো। যদিও সে কোন কথা বললো না, তথাপি তার দৃষ্টিতেই ছিল মস্ত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

'হ্যাঁ নষ্ট করছে, আমি বলবো। সত্যি বলো তো, তোমাদের প্রতিভা দিয়ে যাদের তোমরা সাহায্য করছো, তাদের দেবার মত কি আছে? বিশেষ করে তোমাদের মত শিল্পীদের—'

অরুণা এবার প্রতিবাদ না করে পারলো না। বললো, 'এটা আমি কিছুতেই মানতে পারলাম না স্যার।'

'কোনটা?' অধ্যাপক রায় যেন লড়াইয়ের জন্ম তৈরী হচ্ছেন।

'এই যে—ওদের দেওয়ার মত কিছু 'নেই কথাটা।' অরুণা ধীর-কণ্ঠে বললো।

'কি আছে বলো। আমি তো বলছি কিছু নেই, একেবারেই কিছু নেই। আমি বুঝতে পারছি তোমার অসুবিধাটা। এ কথাটা তোমার স্বীকার করতে কষ্ট হবে, কারণ, তুমি ওদের সংগে খুব কাছাকাছি মিশে আছ। নিজেকে একটু সরিয়ে নাও, নিরপেক্ষভাবে একটু যাচাই করে দেখো, তখন বুঝতে পাববে আমার কথাই ঠিক।'

অধ্যাপক রায় সিগারেটে টান দিলেন, এবং অরুণা কিছু বলার আগেই বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আবেকটা কথা। স্যার আছি কলেজে, বাড়ীতে অন্যভাবে কথা বলার চেষ্টা কবো তো।'

অরুণা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। বুঝতে পাবলো না, অকস্মাৎ এ কথার কি মানে হয়। কিন্তু লজ্জায় যেন সে ভেংগে পড়তে লাগলো, আর অধ্যাপক রায়ের উক্তিব প্রতিবাদ করার সুযোগও তাব অলক্ষ্যে পার হয়ে গেল।

অধ্যাপক রায় সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় বললেন, 'আর থাকলেই বা তোমার তাতে কি?

'বাঃ—' যেন আপনার থেকেই বেরিয়ে গেল অরুণার মুখ থেকে।

'হ্যাঁ, তোমার তাতে কি। তোমার জীবনের সংগে রাজনীতির বা আর্ত-সেবার কি সম্পর্ক, বলো তো?'

অরুণা সত্যসত্যই বিস্মিত হয়েছিল। বললো, 'বাঃ, আমার জীবন কি এদের বাইরে?'

'এদের ভেতরে তা-ই বা তোমাকে কে বললো, বলো তো ?'

অরুণা আরও আশ্চর্য হ'লো। তার জীবন সর্বসাধারণের জীবনের বাইরে নয়, সামাজিক জীবনের বাইরে নয়। এটা তো অত্যন্ত সাধারণ কথা, সত্য কথা। এই সাধারণ কথাটা অধ্যাপক রায় কেন স্বীকার করছেন না, তা সে বুঝতে পারলো না। আর এই সহজ সত্য কথাটা সে ওদের অধ্যাপক মহাশয়কে কি করে বোঝাবে, আকাশ-পাতাল ভেবেও সে কোন কূলকিনারা পেল না।

অধ্যাপক রায় বলতে লাগলেন, 'তোমার এখনও impressionable age. জীবনের কোন অভিজ্ঞতা নেই; তাই যে যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছো। আরেকটু অভিজ্ঞতা হোক, বয়েস হোক, বুঝতে পারবে আসলে মানুষের প্রকৃতিটাই হলো individualistic. নিজের কাছে যা সুখকর তাই সে চায়, তাই সে করে। এখানে যদি কেউ এসে বাধা দেয় তো সে কিছুতেই তা মানে না; মানতে বাধ্য হলেও কোন না কোন সময় সে বিদ্রোহ করবেই করবে, জেনে রেখো।'

অরুণা বুঝতে পারলো অধ্যাপক রায়ের বদ্ধমূল ধারণাগুলো অকস্মাৎ সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর উক্তির সত্যাসত্য নির্ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। অথবা নিজের অসংলগ্ন চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে প্রকাশ করার মত শক্তিও সে সঞ্চয় করতে পারলো না। চুপ করে বসে রইলো সে। কিন্তু অনুভব করতে লাগলো, অধ্যাপক রায়ের চোখজোড়া যেন তার দেহের সংগে মিশে রয়েছে।

কিন্তু অধ্যাপক রায়ের উত্তেজনা তখনো কমেনি। তিনি বলে চলেছেন, 'এই যে তুমি এইসব বাজে কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছো, তাতে you are definitely going against your own self.

আর এর জন্যে দেখবে একদিন তোমাকে আফ্‌সোস্ করতেই হবে, বলে দিলুম। আর তখন that will be too late.'

অধ্যাপক রায় এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। অরুণা নিতান্তই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, অথচ এর মধ্যে নিজেকে অসহায় ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারলো না। ইতিমধ্যে তার মুখের আরক্ত আভা কখন মিলিয়ে গিয়েছে, এবং একটা শঙ্কিত ম্লানিমা যেন নেমে এসেছে। মুখে হাত দিলেই যেন সে তা বুঝতে পারবে।

অবশেষে ত্রিদিব রায়ই এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানলেন। বললেন, 'আমার হয়েছে কি জানো, তোমাদের প্রতি মায়া হয়। তোমাদের মত প্রতিভাবান শিল্পীরা নষ্ট হয়ে যাবে, এটা আমার কিছুতেই সহ্য হয় না।..... যাক্‌গে, তোমার ভাবনা তুমি ভেবে মরবে। আমার যা ভাল মনে হ'লো তাই বললাম, তোমার ভালর জন্যই বললাম।...বাঁচার মত করে কেন বাঁচবে না, তাই আমার আশ্চর্য লাগে।'

রায় চুপ করলেন। অরুণা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যে ভাবে বাঁচা উচিত, সেই ভাবে সে বেঁচে আছে কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা পরেও সে করতে পারবে। আপাতত রায়ের বক্তৃতা যে বন্ধ হয়েছে সেজন্য সে কাকে যে ধন্যবাদ দেবে তা খুঁজে পেল না।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক-পত্নীও সমস্ত যোগাড় যন্ত করে ফিরে এসেছেন। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'দেরী করে ফেলেছি ভাই, না? ওঁর অতিথিদের আবার যথার্থ আদর যত্ন না হ'লে উনি আমার মুখই দেখেন না।' স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি।

অরুণা ভেবে পেল না, এই সংবাদ তাকে দেওয়ার কি অর্থ।

অধ্যাপক-পত্নী অরুণাকে ভেতর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক মহাশয়ও তার স্থূল দেহটাকে টানতে টানতে অনুসরণ করলেন

ওদের। তিনি কোলাহল ও আমোদপ্রিয় লোক, একলা থাকতে পারেন না।

অধ্যাপক রায় থেকে অধ্যাপক পত্নীকে ভাল লাগলো অরুণার। কেমন যেন মিষ্টি চাল-চলন, কেমন মিষ্টি কথাবার্তা। অথচ কোথায় যেন একটু গোপন ব্যথা লুকিয়ে আছে বোঝা যায়।

বিদায় নেওয়ার কালে অধ্যাপক রায় আবার বললেন, 'আমার কথা শোন, ওসব ছেড়ে ফেরে দাও। নিজের প্রতিভার বিকাশ করো।'

অধ্যাপক-পত্নী বললেন, 'আবার কবে আসবে ভাই?'

অরুণার মন বলছিলো, কোনদিনই না। কিন্তু মুখ যেন প্রতারণা করলো, 'বললো,' শীগগীরই আসবো আবার।'

অধ্যাপক রায় ছো মেরে ধরলেন এই সুযোগটাকে। বললেন, 'ঠিক আসবে তো, ঠিক? দেখো গুরুজনদের সংগে ফাঁকিঝুকি করতে নেই। বুঝলে?'

অরুণা মাথ নাডলো, কিন্তু মনটাকে বুঝলো না হয়তো।

সাত

কলকাতার আত্মসমাহিত বাসিন্দারা, এবং সেই সব সৌখিন রাজনীতিবিদরা যাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাস্তবের হিসেব রাখে না, এবং সরকারী বিবৃতি বিবরণই যাদের রাজনৈতিক বিচারের তুলাদণ্ড, তারা আশা করেছিলেন যে, দিল্লী-চুক্তির পর পূর্ব-বাংলার সমস্যাটা আর মোটেই জটিল থাকবে না। বন্ধ হ'য়ে যাবে মানুষের বাস্তুত্যাগের হিড়িক, আর আগে থেকেই যারা এসে গিয়েছিল, তাদেরও পড়বে ফিরে যাওয়ার ধুম। অর্থাৎ; উৎকণ্ঠাটা যদিও ছিল সর্বাত্মক ও সর্বজনীন, তথাপি এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও তারা এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করছিলেন যে, আসলে সমস্যাটা কোনদিনও আয়ত্তের বাইরে যাবে না। সর্বকালেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে যেমন স্বভাবতই ফিরে আসে শান্তি, এও তেমনি হ'বে, তবে একটু সময় নিতে পারে। উৎকণ্ঠার স্বরূপটা ছিল মূলত এই, ফলে এর মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল কিনা বলা কঠিন। বরং মনটা শান্তই ছিল বোধ হয়। তাই, কোন এক শুভ দিনে তারা আবার বিস্ময়ে দেখলেন যে, সমস্যাটা তাদের হিসেবের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে না। ক্রমেই যেন তা এক বিপুলায়তনে ফুলে ফেঁপে উঠছে। আসা বন্ধ হওয়া আর ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজনের পরিবর্তে দেখা গেল আসার তরঙ্গায়িত অভিযান, যে অভিযান কোনকালে সমাপ্ত হ'বে বলে মনে হয় না। এই বিস্ময়ে যেন তারা চমকে উঠলেন।

এমনি চমকে-ওঠা অসহায় অবস্থায় যা হয়, বা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও হ'লো তাই। কলকাতার মানুষরা আর সৌখিন রাজনীতি-

বিদ্‌রা তাদের হিসেবের ভুলটা স্বীকার করলেন না, বরং হিসেবটাকে মেনে না চলায় দোষারোপ করলেন পূর্ব-বাংলার মানুষগুলোকেই ; যারা চলে এসে তাদের হিসেবটাকে একটা অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলেছে। বাস্তবের সাক্ষ্য গ্রহণ করে হিসেবটাকে সংশোধন করার চেষ্টা করলেন না তারা, উল্টো সমস্ত আক্রোশটা ফলাতে লাগলেন সেই মানুষগুলোর পরেই। এমনি এক বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখা গেল, পূর্ব বাংলার জন্য যতখানি দরদ আছে বলে তারা মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে অতটা দরদ তাদের নেই। তাই আগে যেখানে একটা পয়সা দান করার জন্য ডান হাতটা উদ্‌গ্রীব থাকতো, এখন তা অনায়াসেই নিজেকে গুটিয়ে রাখে পকেটে। তাতে বরং খুসীই হয়। এর মধ্যে যেন কোথায়ও কোন অসঙ্গতি নেই। আগের কাজটা যেমন ছিল, স্বাভাবিক, পরের কাজটাও তেমনি স্বাভাবিকই মনে হ'লো তাদের।

আর তাদের মধ্যে যারা বনেদিগোছের, তারা সমস্যার বিচার করলেন ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের খতিয়ান দিয়ে। লাভের জন্য যেখানে পয়সা বা বুদ্ধিও খরচ করতে হয় না, সেখানে কে গ্রহণ করবে না তাকে? তারাও সহজ প্রবৃত্তির বশেই গ্রহণ করলেন ; দশ টাকার জমিকে দু'শ টাকায় বিক্রী করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ হ'লো না তাদের ; বরং দু'শকে চারশ'য় তুলতে পারলে ব্যাপারটা যেন আরও একটু সুবিধাজনক হয়। কিন্তু, এই বনেদি লোকেরাও দুদিন বাদেই দেখলেন যে, মাটির হিসেবে যেন চলছে না আর ; এবার মানুষের হিসেব চাই। তবে সেটা বিক্রয় নয়, ক্রয়। আগে মাটি বিক্রী করে এবার মানুষ কেনার চিন্তায় বিভোর হ'লেন। ব্যাপারটা কিন্তু আটকালো না কোথায়ও। আর আটকাবেই বা

কেন? সত্যিই তো, দুটো জিনিষই তো সমান দরের। শুধুমাত্র মানুষের বুদ্ধির বিভ্রমে মাটি আর মানুষকে পৃথক দেখায়।

সাধারণ মানুষ ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থাৎ জওহরলাল নেহরুর মনের হিসেব নিতে পারলো না, কিন্তু, পশ্চিম বাংলা সরকারের হিসেব নিয়ে বুঝতে পারলো তারা যে তাঁদের মনোভাব অন্তত কলকাতার বাসিন্দাদের মত সমান উদার ছিল। তাই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরাও আবিষ্কার করলেন যে, তাঁদের উদারতাও অবশিষ্ট নেই আর। অন্নসত্রের জন্য যে বরাদ্দ তারা পূর্ব থেকেই করে রেখেছিলেন, তাও নিঃশেষে উজার হয়ে গিয়েছে। সুখের কথা, এর জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা ছিল না। তাই মন্ত্রিসভার কেউ কেউ অন্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন যে, এ নিয়ে আব চিন্তা করারই অবকাশ নেই। এই দিনে চিন্তা না করতে পারাটা অন্তত কম কথা নয়।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সহজে মুক্তিও পেলেন না তাঁরা। ঝড়ের মাতন যদি জাগে, তো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তার স্পর্শ লাগবেই লাগবে। তাঁদের দেহেও লাগলো। তাই, নাম-বাঁচানো মান-বাঁচানো ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তাঁরা ঝড়ের মাতন প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হ'লেন। কিন্তু সর্বভাবে কলকাতার বাসিন্দাদের প্রতিবিম্ব হওয়ায় তাঁরাও ওদের মত ভুল করলেন হিসেবে; আর ওদেরই মত ভুল হিসেবে সত্য সমস্যাটাকে সমাধান করার চেষ্টা করলেন।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগতভাবে লাভের অংকটাও ভুললেন তাঁদের কেউ কেউ। এই হিসেবের চক্রে ও চক্রান্তে পরে শিয়ালদা স্টেশনে সমবেত-হওয়া মানুষগুলোর জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হ'লো। নতুনের মধ্যেও এ যেন এক নতুনতর জীবন।

কিন্তু এই কথাটা পৃথিবীময় ঘোষিত হ'লো না; ঘোষিত হ'লো, পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্ট ও পশ্চিম বাংলার মহাপ্রাণ জনসাধারণ পূর্ব বাংলার মার-খাওয়া মানুষগুলোকে যে কোন মূল্যে আশ্রয় দান করতে প্রস্তুত।

হ্যাঁ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় সত্যসত্যই বিরক্ত হয়ে গেছেন। সেই সকাল থেকে,—তখনও তাঁর ঘুমই ভাংগেনি—, একপাল বাড়ীঘর-ছাড়া লোক এসে বাইরের বৈঠকখানা ও বসবার ঘর এবং বারান্দায় ভিড় জমিয়ে আছে। প্রথমে ঘোষ মহাশয়ের সেক্রেটারি, পরে স্বয়ং ঘোষ মহাশয় এদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বর্ত্তমান অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু কোন কিছুই ফলপ্রসূ হ'লো না। এদের চাওয়ার পেছনে যে যুক্তি নেই, এবং সরকারের পক্ষেও একবাক্যে তা মেনে নেওয়ায় যে ভীষণ ব্যবহারিক অসুবিধে রয়েছে, এ কথাটা কিছুতেই এরা বুঝতে চাইছে না। অপরিসীম ধৈর্য ও প্রগাঢ় যুক্তিবত্তা এবং এদের অনুভূতির ওপর যুগপৎ আঘাত করে ঘোষ মহাশয় এ বিপদ ও বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছেন, বলছেন, এত বড় পরিকল্পনা কার্যকরী করা সময়সাপেক্ষ, এ কথাটা স্মরণ রেখে যেন এরা চলে যায়, সময়ে সব কিছুই হ'বে, অধীর হ'লে চলবে না।

কিন্তু, এদের পক্ষ থেকে অস্ফুট গুঞ্জনে শুধু এ আবেদনটাই বারবার বিঘোষিত হ'লো যে, অবিলম্বে সরকারী সাহায্য ও ব্যবস্থাপনায় এদের বসবাস ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা না হ'লে এরা আর বাঁচবে না।

মহামুস্কিল ঘোষ মহাশয়ের। এ কাজের জন্য সরকারের নির্দিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে, যা করবার তারাই করছে ; আর তারা যা করছে না, তা আর কারো পক্ষে করা সম্ভবও নয়। অথচ এই সাধারণ কথাটা এরা বুঝতে চায় না কিছুতেই। অবশেষে ঘোষ মহাশয় চটেই গেলেন ; বললেন, 'বার বার অত করে তোমাদের বলছি ও আমার হাতে নয় আমার হাতে নয়, আমাকে দিয়ে এর কিছুই হ'বে না, তবু কেন তোমরা বুঝতে চাচ্ছ না, শুনি? কেন তোমরা এখানে ভিড় করে আছ, কেন? এক্ষুণি যাও সব এখান থেকে, এক্ষুণি।' বলার সংগে সংগেই তাঁর সেক্রেটারি এবং অন্যান্যরা যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন হুকুমটাকে তামিল করার জন্য এগিয়ে এলো। উত্তেজনায় যেন থর্ থর্ করে শরীরটা।

কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন না তিনি। সোজা প্রাইভেট বৈঠকখানায় এসে বসলেন একটা চেয়ারে। সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন, যে ভাবেই হোক অবিলম্বে বাড়ী পরিষ্কার করতে হবে ; আর আজ কোন আগন্তুকের সংগেই দেখা করবেন না তিনি। মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে একটা, এরা যেন তা স্মরণ রাখে।

আর্দালিকে ডেকে সরবতের হুকুম দিলেন তিনি।

বাইরের বাড়ী-ঘর ছাড়া লোকগুলোর মধ্যে একটা বিড়্বিড় তরঙ্গ খেলে গেল। কেউ কেউ যেন একটু উষ্ণও হ'লো। কেউ আবার ঘোষ মহাশয়ের মতই বিরক্ত হ'লো। আর একজন দুজন করে নিশ্চিত-রূপেই ভিড় কমতে লাগলো। এদেরও যেন ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

প্রাইভেট বৈঠকখানায় পূর্ব থেকেই মূলচাঁদ আগরওয়ালা বসে-ছিলেন। ঘোষ মহাশয় উপস্থিত তাঁকেই পরম অবলম্বনরূপে পেলেন। বললেন, 'দেখুন দেখি মশাই কাণ্ডটা—'

মূলচাঁদ একদিকে ঘৃণা আরেকদিকে সহানুভূতি মিশ্রিত করে বললেন, 'বড্ড বাড়াবাড়ি করছে স্যার এরা।'

ঘোষ মহাশয় তখনও উত্তেজিত; বললেন, 'কিন্তু বাড়াবাড়ি করলেই তো হ'লো না। ইচ্ছে করলেই যা খুসী করতে পারি নাকি, আমরা, না ইচ্ছে করলেই সরকারী পলিসি বদলাতে পারে কেউ?'

মূলচাঁদ নীরব হাসিতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন

ঘোষ মহাশয় বলতে লাগলেন, 'ওদের এই বাড়াবাড়ির জন্যেই আচ্ছা শাস্তি পাবে ওরা একদিন, কঠিন শাস্তি।'

মূলচাঁদ সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক কথা স্যার, বাড়াবাড়ির জন্যেই মরবে ওরা। নইলে গরীব, বেচারা লোক, আমরা সবাই তো স্যার বেশ দরদের সংগেই ওদের কথাটা ভাবছিলাম—'

'কিন্তু মশাই এ যা হচ্ছে, দরদ ফরদে আর চলবে না।'

'কি কথা, স্যার।'

ঘোষ মহাশয় সরবতে চুমুক দিলেন। কিন্তু অত্যন্ত রুক্ষ, কঠিন মনে হলো নিজের কথাটাকেই। তাঁর মনের এই রূপান্তরে তিনি যেন বিস্মিতই হচ্ছিলেন সংগোপনে। কেন না, এই কালই তিনি এক উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়েছিলেন, এবং তাদের সুখদুঃখের মধ্যে প্রগাঢ় আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন। সে সব কথা এবং আশ্বাস প্রকৃতই কি ছিল ফাঁকা? শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় অনুভব করছেন, সরকারী নীতি তো ইতিমধ্যে ডিপার্টমেণ্টে ডিপার্টমেণ্টে প্রচারিত হয়েই ছিল, তাঁর মনটাও আজ সুনির্দিষ্টভাবে মোড় নিচ্ছে। সরকারী নীতির সংগে ব্যক্তিগত মতামতের পার্থক্য আর যেন এতটুকু অবশিষ্ট নেই।

বৈঠকখানা কাঁপিয়ে অধ্যাপক ত্রিদিব রায় প্রবেশ করেই বললেন, 'বাইরে যে একেবারে হাট বসিয়েছেন, পঞ্চাননদা।'

ঘোষ মহাশয় খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আর বলো না ভাই, জীবন অতিষ্ঠ করে তুললে।'

'কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ হ'লে তো চলবে না পঞ্চাননদা; এ আর সহ্য করা চলছে না কিছুতেই, something has got to be done.'

'তা তো বটেই স্যার।' মূলচাঁদের কণ্ঠস্বর।

ঘোষ মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না দেখে অধ্যাপক রায় পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের মানে গভর্ণমেণ্টের পলিসিটা কি, শুনতে পারি?'

ঘোষ মহাশয় হাসলেন, বললেন, 'তা কি সব সময় প্রকাশ করা নিরাপদ, ত্রিদিব?'

অধ্যাপক রায়ের ধারণা তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুযোগ পেলেই সে বিশ্বাসের এক আধটু পরিচয় দিতে ছাড়েন না। তাই ঘোষ মহাশয়ের উক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না। বললেন, 'কেন তাতে অসুবিধের আছেটা কি? একটা ডেমোক্র্যাটিক গভর্ণমেণ্ট যদি, তার নীতিগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা না করতে পারে, তো কি?'

অধ্যাপক রায়ের অভিমতকে সম্ভবত ঘোষ মহাশয় বিশেষ উঁচু দরের বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাই সংগে সংগেই বললেন, 'উত্তরটা খুবই সহজ, ত্রিদিব, when that Government has definite limitations—'

'Limitations? মানে? আপনিও কি leftistদের মত কথা বলতে সুরু করলেন নাকি?'

ঘোষ মহাশয় এবং মূলচাঁদ বাবু দুজনেই হাসতে লাগলেন।

সেই হাসির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করে রায় বলতে লাগলেন,

'ডেমোক্র্যাসির এ হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপ। এই কর্মই পৃথিবীর সমস্ত দেশে চালু রয়েছে। একে আপনি কি অর্থে যে limited বললেন বুঝতে পারলাম না একটুও।'

ঘোষ মহাশয় সম্ভবত এই অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মৃদু হাসতে লাগলেন, এবং বললেন, 'যাক্ মনে করো ও একটা কথার কথা। আর তুমি যে মনোভাব ব্যক্ত করেছ গভর্ণমেণ্টের মনোভাবও তা থেকে বেশী দূরে নয়।'

টেবিলে একটা চাপড় দিয়ে অধ্যাপক রায় বললেন, 'তাই বলুন।'

সরকারী বিশ্লেষণের সংগে তাঁর চিন্তাধারার মিল দেখে মুখ্যত অধ্যাপক রায় খুসী হ'লেও, মনে মনে ক্ষুণ্ণই হলেন তিনি। কেন না, ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর সংগ্রামস্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এমনি সময়ে তিনি জাঁদরেল জাঁদরেল প্রতিপক্ষকে তাঁর বক্তৃতার তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। মানুষকে ঘায়েল করা, কথার তুবড়িতে প্রতিপক্ষকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারায় কি অসীম আনন্দ লাভ করেন তিনি, কী অদ্ভুত গর্বে বুকটা কেঁপে ওঠে তাঁর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরূপ প্রতিপক্ষ তাঁর এখানে কেউ ছিল না; তাই একটু দম নেবার অবসর পেলেন তিনি।

অধ্যাপক ত্রিদিব রায় হলেন সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা মনে করেন যে গভর্ণমেণ্টকে বাঁচানোর সর্ববিধ দায়িত্ব কিভাবে যেন তাঁদের স্কন্ধেই এসে বর্তিয়েছে; যাঁরা মনে করেন, বর্তমান সমাজকে রক্ষা করা, বর্তমান জীবনপ্রণালী, সংস্কৃতি ও সর্বপ্রকার সামাজিক আদর্শকে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য আক্রমণ ও ক্ষয়ের স্পর্শ থেকে রক্ষা করার সুমহান ও পবিত্র দায়িত্ব তাঁদের মত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই গ্রহণ করতে হবে। সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা স্থানে অস্থানে

তাঁদের আদর্শের পক্ষে ওকালতি করেন, তাঁদের আদর্শের উপর বিন্দুমাত্র কটাক্ষপাতে তাঁরা জ্বলে ওঠেন, এবং প্রতিপক্ষের সীমাহীন অজ্ঞানতা লক্ষ্য করে তাঁরা বিদ্রূপের হাসি হাসেন। আর যাঁরা মনে করেন, তাঁদের অনুসৃত আদর্শকে স্বীকার না করাটাই হ'লো একটা অমার্জনীয় এবং নিদারুণ মূঢ়তা।

তাই, বর্তমান গভর্ণমেন্টের মস্ত বড় স্তম্ভ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়কেও সংশোধন করার স্পর্ধা রাখেন তিনি।

ঘোষ মহাশয় ইতিপূর্বেই সরবত নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। এর মধ্যে অধ্যাপক রায়ের জন্য এবং মূলচাঁদ বাবুর জন্য খাবার এলো, চা এলো। অধ্যাপক রায় খেতে খেতে বলতে লাগলেন, 'এ ছাড়া গভর্ণমেন্টের করবারই বা কি আছে? প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মের গোড়ার কথাই হ'লো objective condition বিচার করে দেখতে হ'বে। প্রথমটায় দেশের আবহাওয়ায় মনে হয়েছিল যুদ্ধটাই পাক-ভারত সমস্যার সমাধানের পথ। সে যখন হলো না, তখন নতুন অবস্থাবিচার করে দেখা গেল, গভর্ণমেন্টের পক্ষে পূর্ববাংলার হিন্দুদের দায়িত্ব গ্রহণ করা সহজ নয়। তাই তো পণ্ডিতজী দিল্লী চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। তার মানেই হ'লো ভারত গভর্ণমেণ্ট চায় যে পূর্ববাংলার হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ বাড়িতেই থাক। কিন্তু, এ না বুঝে এবং গভর্ণমেণ্টকে উপেক্ষা করে যদি ওরা আসতে থাকে তো গভর্ণমেণ্ট ওদের নেবেনই বা কেন?'

অধ্যাপক রায় চায়ে চুমুক দিলেন। তাঁর কথার ভংগীতে মনে হ'লো যেন ভারত গভর্ণমেন্টের হয়ে তিনি বিদেশী সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করছেন। কিন্তু তাঁর কথার সমর্থন করতে হবে কি প্রতিবাদ করতে হ'বে, ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে ঘোষ মহাশয় এবং মূলচাঁদ দুজনেই চুপচাপ বসে রইলেন।

একটু থেমে অধ্যাপক রায় পুনরায় আরম্ভ করলেন, 'আর এও বলে দিচ্ছি পঞ্চাননদা গভর্ণমেণ্ট যদি এখন থেকেই শক্ত না হয়, তাহ'লে there are forces working যারা—'

ঘোষ মহাশয় চোখ তুলে তাকালেন এবং একটু চিন্তান্বিত ভাবেই যেন বললেন, 'কার কথা বলছো, ত্রিদিব ?'

অধ্যাপক রায় অধ্যাপক-সুলভ বিজ্ঞের হাসি হাসলেন, যে হাসিতে সাধারণ মেশানো থাকে অবজ্ঞা ও অনুকম্পা। সশব্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তাও আমাকেই বলে দিতে হ'বে ?'

ঘোষ মহাশয় চোখ নামালেন, এবং যেন অকস্মাৎ একটা গভীর সত্য আবিষ্কার করেছেন, এমনি, চমক দেখিয়ে বললেন, 'ও: শ্যামাপ্রসাদের কথা বলছো তো।'

অধ্যাপক রায় আত্মতৃপ্তির হাসিতে ঘোষ মহাশয়ের প্রাইভেট বৈঠকখানা আমোদ-চঞ্চল করে তুললেন, এবং হাসি বন্ধ হওয়ার আগেই বললেন, 'দেখুন, নামটা কিন্তু আমি বলিনি।'

চটপট উত্তর এলো, 'কেন, ভয় পাও নাকি ?'

'ভয় পাব আমি ? আমি ?—অবাক করলেন পঞ্চাননদা।' অধ্যাপক রায় একটু নড়ে বসলেন। ভাবখানা এমনি যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বাজি এবং অন্যান্য কৃতি-কুশল ব্যক্তিদের বরাত নেহাৎ ভাল যে অধ্যাপক রায় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। নইলে, কার বুকে ক'টা হাড় আছে তা তিনি টের পাইয়ে দিতেন।

এই বেসুরো ভাবটা কেটে যাওয়ার পর অধ্যাপক রায় বললেন, 'বলিহারি যাই বুদ্ধির! মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন বলে কি দেশদ্রোহিতা করতে হ'বে ?'

শব্দটা বোধ হয় ঘোষ মহাশয়েরও পছন্দ হ'লো না। তিনি কটু কটাক্ষে অধ্যাপক রায়ের দিকে তাকালেন।

কিন্তু রায় দমবার পাত্র নন। ঘোষ মহাশয়ের কটাক্ষকে উপেক্ষা করে তিনি বলতে লাগলেন, 'দেশদ্রোহিতা নয় তো কি বলুন? যে মুহূর্তে গভর্ণমেণ্ট চাইছেন, পূর্ববাংলার হিন্দুরা তাদের বাড়ী ঘরেই যাক, সেই মুহূর্তে কলকাতায় বসে এসব গরম গরম বক্তৃতা দেওয়ার কি মানে হয়?……বলবেন গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা। বুঝলুম, কিন্তু পূর্ববাংলায় তার ফলটা কি হ'চ্ছে তা দেখতে হ'বে তো? এসব বক্তৃতার ঠেলায়ই তো হাজার হাজার লোক বাড়ীঘর ছেড়ে পথে নামছে। এতে একদিকে জনসাধারণের শত্রুতা, আর একদিকে গভর্ণমেণ্টের শত্রুতা। একে আপনি দেশদ্রোহিতা বলবেন না? এটাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলবেন?'

অধ্যাপক রায় সিগারেটে দম দিলেন। আর তাঁর বক্তৃতার আস্বাদন গ্রহণ করে মূলচাঁদ আগরওয়ালারও মনে হলো যে, ডাঃ মুখার্জির মত মূর্খ অবিবেচক লোক ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই। বেচারা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ!

মূলচাঁদবাবু সম্ভবত এমনি একটা আবহাওয়া সৃষ্টির প্রতীক্ষায়ই ছিলেন। এবার মুখ খুললেন, বললেন, 'একটা জরুরী কথা ছিল, স্যার—'

'বলে ফেলুন।' ঘোষ মহাশয় উত্তর দিলেন।

'এই স্যার রিফিউজিদের ব্যাপারটা—আমার মুরারীপুকুরের প্লট-টাকে স্যার একেবারেই নষ্ট করে ফেললে। নিজেদের ইচ্ছেমত স্যার মাটি কেটে পথ বানিয়ে কী-সব যে করছে,—'

অধ্যাপক রায়ই মুলচাঁদের কথার বাকী অংশটা পূরণ করলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এর একটা ইয়ে হওয়া উচিত। ভিক্ষে করতে এসেছিস, তো ভিক্ষেই কর; তা না, করতে সুরু করেছিস ডাকাতি।'

'হ্যাঁ স্যার, স্রেফ ডাকাতি।'......

ঘোষ মহাশয় সংবাদপত্র থেকে মুখ তুললেন না।

মূলচাঁদ আমতা আমতা করে বললেন, 'এর একটা স্যার বিহিত—

'বিহিত শীগগীর শীগগীর করে ফেলুন,' অধ্যাপক রায় প্ররোচনা দিলেন।

'সে তো ঠিক স্যার, কিন্তু কি—' স্পষ্টত মূলচাঁদবাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের কথার প্রতীক্ষা করছেন।

ঘোষ মহাশয় সত্যই বলতে লাগলেন এবার, 'দেখুন, আপনি কি করবেন বা করতে পারেন, সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই আপনাকে কোন পরামর্শ দেবে না, তবে—'

'তবে গভর্ণমেণ্ট sanctity of private property নিশ্চয় রক্ষা করবেন,' অধ্যাপক রায় অবশিষ্ট পাদ পূরণ করলেন, এবং মন্তব্য করলেন, 'এতে আবার জিজ্ঞাসাবাদের কি আছে। এ হলো আইনের ব্যাপার; আইন আপনার পক্ষে, সুতরাং গভর্ণমেণ্টও আপনারই পক্ষে। আর যা করার ঝটপট করে ফেলুন, ও আপদ বাড়তে দেবেন না, নয় কি পঞ্চাননদা?'

ঘোষ মহাশয় বললেন, 'সে তো ঠিকই, গভর্ণমেণ্টকে আইন রক্ষা করতেই হ'বে, সেটা যার পক্ষেই না কেন যাক।'

মূলচাঁদ আশ্বস্ত হলেন, এবং তৃপ্তির লক্ষণস্বরূপ হাত কচলাতে লাগলেন। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি হাসতে পারলেন না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের প্রাইভেট বৈঠকখানায় এমনি ধরণের আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে এমনিভাবে নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হয়ে চলেছে। সেখানে হয়তো বা আরো অনেক মূলচাঁদ, আরও অনেক অধ্যাপক এবং আরো

অনেক সুজাতা মুখার্জির যাতায়াত আছে প্রতিনিয়ত। সর্বসাধারণের জন্ম সংবাদপত্রে সরকারী দপ্তর থেকে যেসব বিবৃতি প্রচারিত হয়, সেসব বিবৃতি অলক্ষ্যে এই আলোচনার মধ্যেই সৃষ্টি হয় না, একথা কে জোর করে বলতে পারে। সম্ভবত ঘোষ মহাশয়ও পারেন না। বিশেষ করে অধ্যাপক রায়ের মত কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ যে আসরে উপস্থিত থাকেন, সেখানে যে কোন সমস্যার সমাধান না হ'য়েই পারে না। যার সমাধান হয় না, সেগুলো সমস্যাই নয়, এটা নিশ্চিত।

মূলচাঁদবাবু কিন্তু সত্যই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই ওঠার আয়োজন করলেন তিনি। কারণ, প্রয়োজনের আকর্ষণে যেমন তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই আসনে বসে থাকতে দেখা যায়, তেমনি প্রয়োজনের আকর্ষণেই অকস্মাৎ চলেও যেতে হয়। আজও উঠলেন তিনি।

'আজ তাহ'লে আসি স্যার।'

'আসুন।'

'আমার সে কথাটা স্যার—'

'কোনটা ?—ওঃ কণ্ট্রাক্টের কথাটা তো ?'

মূলচাঁদ হাসিতে ও ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন।

'ও আমার বেশ মনে আছে, সেজন্ম ভাববেন না।'

কিন্তু মূলচাঁদ ঘোষ মহাশয়কে ও অধ্যাপক রায়কে নমস্কার করে দু পা অগ্রসর হয়েও আর অগ্রসর হতে পারলেন না। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত এবং উদ্বেগ-ব্যাকুলভাবে ডাঃ শচীশ সেন প্রবেশ করলেন। আজকাল ডাঃ সেন যেন বেশী রকমের সিরিয়স হয়ে যাচ্ছেন। ঘোষ মহাশয় তাঁকে বিশেষ বুঝতে পারছেন না, তাই ডাঃ সেন এলেই বেজায় অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। ডাঃ সেন যেন বলতে বলতেই প্রবেশ করলেন, 'এর কোনই মানে হয় না, কোনই মানে হয় না।'

'কি ভাই কি ?' ঘোষ মহাশয় জিগ্যেস করলেন।

'হয় স্পষ্ট করে বলে দিন চলে যাক, না হয় মেরে ফেলুন।'

'কি হয়েছে শচীশ ?' ঘোষ মহাশয় সংযতভাবে পুনরায় প্রশ্ন করেন।

'এক একটা দিন যাচ্ছে আর শত শত করে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। জানেন আজ পাঁচদিন শিয়ালদার রিফিউজিরা না খেয়ে ?'

'তা গভর্ণমেণ্ট কি করবে?' অধ্যাপক রায় আশ্চর্য হলেন।

ঘোষ মহাশয় খবরের কাগজের মধ্যে মুখ লুকোলেন। আর বিলম্ব করা উচিত নয় মনে করে মূলচাঁদ নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কিন্তু ডাঃ সেন রায়ের কথা শুনতে পেলেন কিনা বুঝা গেল না, অথবা শুনে থাকলেও গ্রাহ্য করলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, 'মানুষগুলো তো মরবেই, তাছাড়া রিলিফ অর্গানাইজেশনগুলোর কী ভীষণ চাপ পড়ছে ধারণা করতে পারবেন না। ওদের তো এটুকু সম্বল। আর আমরাই বা কি করছি, এখন যা দিচ্ছি তাকে আর অষুধ বলা যায় না। এমনি প্রতারণা করে লাভ কি ?'

'না না, এতে প্রতারণাটা কি হলো বুঝতে পারলাম না।' অধ্যাপক রায় পুনরায় বললেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অসহায় মানুষগুলোর প্রতি অনিচ্ছাকৃত বঞ্চনা এবং ঘটনাবলীর বীভৎসতার জন্য ডাঃ সেন সম্ভবতঃ একটু উত্তপ্তই ছিলেন। যাই হোক সেই উত্তাপকে যতটা সম্ভব সংযত করে তিনি বললেন, 'কি বুঝতে চাও, খুলে বলো তো ত্রিদিব ?'

ডাঃ সেনের মানসিক উষ্ণতা অধ্যাপক রায়ের অনুভূতিকে ফাঁকি দিতে পারলো না। কিন্তু রায়ও তো আর সংগ্রামভীরু সাধারণ লোক নন। তিনি এই অনুচ্চারিত চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করলেন, মনে মনে সংকল্প

করলেন, আজ শচীশদাকে একটু সমঝিয়ে না দিলে আর চলছে না। বললেন, 'এই যে আপনি বললেন প্রতারণা,—গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে কি করতে পারতো বলুন তো?'

'অন্তত এক মুঠো করে ভাত দিতে পারতো এই লোকগুলোর মুখে।'

'কাজটা কি অতই সহজ মনে করেন শচীশদা?' অধ্যাপক রায়ের মুখে এক টুকরো ব্যঙ্গাত্মক হাসি।

'তোমার আমার পক্ষে সহজ না হ'তে পারে, কিন্তু একটা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এমন কি কঠিন শুনি?' ডাঃ সেনের ভংগীটাও যেন ব্যঙ্গের সুরে ভরে ওঠে। তিনি নিজেই আশ্চর্য হন।

'গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ? আর সহজ হ'লেই বা গভর্ণমেণ্ট তা করতে যাবে কেন? গভর্ণমেণ্ট কি আসতে বলেছিলো ওদের? আমাদের হাতে কি resource আছে তাও তো দেখতে হবে? কেউ যদি জেনে শুনে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে আসে তো গভর্ণমেণ্ট তাদের দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকবে কেন?' অধ্যাপক রায় মুখস্তর মত বলে যান।

ডাঃ সেন বোধহয় আর সামলাতে পারলেন না। বললেন, 'তোমার ঐ বক্তৃতা কলেজের শুকনো দেয়ালগুলোর কাছে দিও ত্রিদিব, বুভুক্ষু মানুষগুলোর কাছে নয়।'

আঘাতটা একটু বড় রকমেরই হ'লো। কিন্তু স্থান ও পাত্র বিবেচনায় উপায় নেই বলেই অধ্যাপক রায়ের পক্ষে একটা জঘন্য রকম কেলেঙ্কারী বাঁধানো সম্ভব হ'লো না। তবে তাঁর তূণে আক্রমণের যেসব মার্জিত বাণ আছে, তার একটি আধটি ব্যবহার না করে তিনি পারলেন না। বললেন, 'মুস্কিল হ'য়েছে কি, পলিটিক্সকে আপনারা পলিটিক্স হিসেবে বিচার করতে জানেন না। মায়া-মমতা এসব বৃত্তি দিয়ে আপনারা পলিটিক্সের বিচার করতে চান।

কিন্তু তখন, সেটা আর রাজনীতি থাকে না, it becomes something else.'

এই উক্তির কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত কিনা এই ভেবে ডাঃ সেন একটা সিগারেট ধরালেন। মনের সঞ্চিত ক্রোধ খানিকটা অভিব্যক্তি লাভ করায় তাঁর শরীরটা এর মধ্যেই বেশ হালকা বোধ হচ্ছিল। অপ্রয়োজনীয় বাগ্‌বিতণ্ডায় সর্বকালেই তাঁর আন্তরিক অনিচ্ছা। তথাপি মাঝে মাঝে এমন এক একটা অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে সামলানো হয় দুষ্কর। যেমন আজকের এই মুহূর্তটা। সিগারেট টানতে টানতে রুমালে মুখ মুছলেন ডাঃ সেন। মিনিট দুই তিন চুপচাপ কাটলো। তারপর অকস্মাৎ বলে ওঠলেন, 'হ্যাঁ, বাস্তবের সংগে কোন সম্পর্ক না থাকলে ও রকম ধারণাই হয়।'

অধ্যাপক রায় এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাই ডাঃ সেনের কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই উত্তর দিলেন, 'আবার বেশী রকম সম্পর্ক থাকলে রাজনীতির ধারণাই পালটে যায় শচীশদা।' বলে একটা আশাতীতরূপ বিজয় লাভ হয়েছে মনে করে অধ্যাপক রায় হেসে ওঠলেন জোর গলায়।

কিন্তু অধ্যাপক রায়ের সম্ভবত আজ দিন ভাল ছিল না। তাই এই বিজয়-হাসির মধ্যেও ঘোষ মহাশয়ের মুখ থেকে 'will you please stop Tridib?' শুনে চমকে উঠতে হ'লো তাঁকে। ঘোষ মহাশয় বলছেন, 'অন্য কিছু আলাপ করো তো তোমরা। মেজাজ একেবারে গুলিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই যে ঝকমারি পোহাতে হ'চ্ছে কি বলবো তোমাদের!'

অধ্যাপক রায় প্রথমটায় ভাবলেন, প্রত্যক্ষভাবে অপমানটা বোধ হয় তাঁকেই করা হ'লো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখে মনে হ'লো,

এ অসম্ভব; ঘোষ মহাশয় তাঁকে কিছুতেই অপমান করতে পারেন না। রায় নীরবে সিগারেট টানতে লাগলেন। আর প্রাতঃকালীন অভিযানটা এখানেই শেষ হ'লো কিনা একমনে ভাবতে লাগলেন।

ওদিকে ঘোষ মহাশয় চূড়ান্তভাবে সংবাদপত্র পাঠ শেষ করে দিয়ে অথবা স্থগিত রেখে ডাঃ সেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তারপর শচীশ, অন্যান্য খবরটবর বলো।'

সেদিনই সন্ধ্যেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় সুজাতা মুখার্জির নিকট হৃদয় খুলে ধরবার চেষ্টা করছিলেন।

ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনের দোতালায় পরিপাটি করে গোছানো একটি ঘর। ঘোষ মহাশয়ের শোবার ঘর। আলোকিত। ঘোষ মহাশয় পাইচারী করছিলেন, আর সুজাতা মুখার্জি সোফায় বসে। মন্ত্রী মহাশয় পূর্বে-থেকেই আজকের সন্ধ্যেটাকে সমস্ত ব্যস্ততা ও কর্ম থেকে মুক্ত রেখেছিলেন; তাই মধ্যাহ্ন ও বৈকালিক কর্ম সেরে সেক্রেটারিয়েট থেকে সোজা বাড়ী ফিরেছেন। মনের শূন্যতা যেন অসহনীয় হ'য়ে ওঠেছে, এই শূন্যতাকে আজ হয়তো বা শুধু অভিব্যক্তি দিয়েই পূর্ণ করে দেবেন তিনি। আজ কৃতসংকল্প তিনি।

হ্যাঁ, ঘোষ মহাশয় অবিবাহিত। স্কুলের বয়েস থেকেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, এবং রীতিমতো যোগ্যতা, দক্ষতা ও কূটবুদ্ধির জোরে সেই সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিলেন। সেই দক্ষতা আজও তাঁর অবলুপ্ত হয়নি। তাই উপদলীয়

চক্রান্ত ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে একাধিকবার পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়ে থাকলেও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের পরিবর্তন হয়নি। তিনি প্রথমেও ছিলেন, এখনো আছেন, এবং পরেও থাকবেন। সে বন্দোবস্ত করার মত বুদ্ধি তাঁর আজও অটুট।

সেই কূটবুদ্ধির দক্ষতায় প্রদীপ্ত ঘোষ মহাশয় আজ হৃদয় মেলে দেবেন। অতীতে রাজনৈতিক কর্মে এবং উপদলীয় প্রাধান্য সংরক্ষণের কার্যে এতো বেশী সময় ও বুদ্ধি ব্যয় করতে হয়েছে যে, মন খুলে ধরার বিশেষ অবকাশ তিনি পাননি। যদিও দু-একবার যে সে আকাশ আসেনি, তা নয়। এই যেমন সুজাতার ক্ষেত্রেই। প্রথমটায় সুজাতার জাঁকজমক চাকচিক্যে চোখ ধাঁধিয়েছিল ঘোষ মহাশয়ের, পরে মন ধাঁধাঁলো। কিন্তু সে তীর্থে আছাড় খেয়ে খেয়েও একটু পদরেণু লাভ হয়নি। হতাশার দীর্ঘশ্বাস হয়তো বেরিয়েছিল বুক থেকে, কিন্তু স্বদেশী কর্মের স্রোতে সে দীর্ঘশ্বাসকে হৃদয়ের সাময়িক দুর্বলতা বলে বিস্মৃত হ'তে পেরেছিলেন তিনি। কোথায় ভেসে গিয়েছে সুজাতা মুখার্জি, অথবা কি-নাম-ওর আজ মনে নেই।

আজ সম্ভবত প্রশ্নটা দীর্ঘশ্বাসের নয়, হৃদয়ের ব্যাকুলতারও নয়, কিন্তু একটা সংসর্গের অভাব অনুভব করছেন তিনি। কাঞ্চন এবং ক্ষমতার সংসর্গ পুরোমাত্রায় ভোগ করছেন তিনি, কিন্তু এছাড়াও আরও একটা সংসর্গের চাহিদা আছে, যা আজ দীর্ঘকাল পরে যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ সংসর্গটাকে শুধু একটা সংসর্গ রূপে দেখতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। তাই একটু হৃদয় রস ঢেলে একে গ্রহণযোগ্য ও ভোগ্য করে তোলার আকাঙ্ক্ষায়

আছেন তিনি। হ্যাঁ গ্রহণযোগ্য ও ভোগ্য করে তোলার আগ্রহ আছে তাঁর। সেজন্য দিন ও পাত্র নির্বাচনের সংগে সংগেই কত কথা যেন জোয়ারের জলের মত উপচিয়ে এসেছিল মনে। কত কথা! কিন্তু এই মুহূর্তে যখন পাত্রী হাতের কাছে, সময়ও শুভ, মনও ভাবনাহীন, তখন কেন যে কথা আটকিয়ে যাচ্ছে ঘোষ মহাশয় কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। হৃদয়রসকে উপেক্ষা করে সংসর্গটাই বড় হয়ে উঠছে যেন।

ঘোষ মহাশয়ের পাইচারির যেন শেষ নেই।

সুজাতা সোফায় বসে। ব্যাপারটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুজাতার মনে। প্রাইভেট বৈঠকখানায় এ সাক্ষাৎকারটা না হয়ে একেবারে শয়ন কক্ষে আহ্বান হওয়ায় সুজাতা প্রথমেই ব্যাপারটা অনুমান করেছিল, পরে ঘোষ মহাশয়ের কথা বলার অক্ষম প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে প্রকৃত কথাটা আপনাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মুচকি হাসির রেখা দেখা দিল সুজাতার ঠোঁটে। কেমন একটা রহস্য-ঘন চাঞ্চল্য যেন মনের মধ্যে খেলে গেল। সুজাতা নিজেও তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল না। তিনটে মানুষ তিনটে মুহূর্ত এবং তিনটে ঘটনা মনের কোণে ভিড় জমাতে লাগলো। ত্রিদিব রায়, ডাঃ শচীশ সেন এবং পঞ্চানন ঘোষ—সুজাতা মানুষ ও ঘটনাগুলোকে পরস্পর সংগ্রথিত করার চেষ্টা করে এবং একের পটভূমিতে অন্যের পরিমাপ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়কে তাঁর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা সে দিতে পারে না, মন্ত্রী হলেও না। বহুদিনের পুরোনো কথা তক্ষণ যেন অকস্মাৎ ফিরে আসে। যে পুরুষ তার মনের কথাকেও অন্তত বিনা সংকোচে প্রকাশ করতে পারে না, তার পৌরুষ অশ্রদ্ধেয়; নারীর কাছে

তাদের আবেদনকে ক্রন্দনের মত শোনায় সুজাতার কাণে। নিজেকে সমর্পণ নয়, অপার করুণা হয় সুজাতার।

কিন্তু ঘোষ মহাশয় অকস্মাৎ বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, সুজাতা, তোমার কি– মানে আমরা যারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছি,—তোমার কি মনে হয় না—মানে তারাও অসুখী।'

বুদ্ধিটা অকস্মাৎ খেলে যেন সুজাতার, কিন্তু সে খেলায় না; মুখ ভার করে বলে, 'হ্যাঁ নিশ্চয়, মানুষের মন তো—'

'তাহ'লে?'—ঘোষ মহাশয় হঠাৎ চুপ করে যান।

'তাহ'লে? তাহ'লে কি?' সুজাতা খোঁচায়।

কিন্তু কোন কথাই আর বেরোয় না ঘোষ মহাশয়ের মুখ থেকে। ঘৃণায় তেতো হয়ে যায় সুজাতার মন। কঠিন আঘাত করার ইচ্ছে হয় ওঁর। কিন্তু দুর্বলকে আঘাত করেও যে আনন্দ নেই!

ঘোষ মহাশয় পুনরায় পাইচারি করতে থাকেন, সুজাতা সোফায় বসে বসে সময় গোনে।

কিন্তু এক সময় সত্যই সুজাতা ওঠার উদ্যোগ করে। ঘোষ মহাশয় বিচলিত হয়ে কাঁচুমাচু করে বলেন, 'যাচ্ছো? সত্যি?'

'হ্যাঁ, মিছিমিছি কি হবে বসে?'

'মিছিমিছি? কেন, থেকে যেতে পার না আজ?' ঘোষ মহাশয় যেন হঠাৎ কথা খোঁজে পেতে আরম্ভ করেছেন।

'মানে?' বলে সুজাতা একটু থামলো, তারপর সমস্ত অশ্রদ্ধা বিরক্তি আর করুণা মিশিয়ে সে বললো, 'দোহাই আপনার, পঞ্চাননদা। দয়া করে, স্পষ্ট করে বলুন তো কি চান আপনি? কেন ডেকেছেন আমায়?' সুজাতাকে যেন উত্তেজিত মনে হয় একটু।

ঘোষ মহাশয় সাধ্যমত সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বললেন, 'মানে যা দাওনি তুমি আমায়, প্রার্থনা করি, আজ দাও, আমার সমস্ত কিছুর বিনিময়ে—'

নিজের কাণেই অদ্ভুত শোনালো কথাটা। সুজাতার চোখে ঠোঁটে যেন বিদ্রূপ লেগে আছে। বললো, 'ওঃ এই ব্যাপার! তা সে উত্তর তো দশ বছর আগেই দিয়েছি আপনাকে।'

'দশ বছর পরে কিছু বলো, দোহাই তোমার।' ঘোষ মহাশয়ের স্বর চঞ্চল, যেন আবেগ মিশ্রিত। সুজাতাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু সুজাতা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। পর্দা টেনে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগেই সে শুনতে পেল ঘোষ মহাশয়ের কণ্ঠস্বর, 'যাচ্ছো? সত্যি?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ।

'তাহলেও পাইয়ে দাও অন্তত'।

ঘোষ মহাশয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যেন তাঁর মনের সমস্ত কথা বলা হলো এবার, যেন পরিপূর্ণভাবে হৃদয় খুলে ধরা হলো।

আজকের সন্ধ্যেটা সর্বভাবেই মাটি হ'লো সুজাতার। একটা ট্যাক্সি করার আগ্রহও যেন ওর রইলো না। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে সে চলতে লাগলো। বাড়ী ফিরবে কি, আর কোথায়ও যাবে, তা ঠিক এই ক্ষণে যেন সে স্থির করতে পারলো না।

ত্রিদিব, ডাঃ সেন, পঞ্চানন ঘোষ—তিনজন মানুষ, কত পৃথক। আর সুজাতার মনেও কত পৃথক। এই চিন্তাই তার মনকে ভরে রেখেছিল।

কতটা পথ সে এমনি করে হেঁটেছে তা ঠিক খেয়াল নেই, অকস্মাৎ একটা নিউ মডেল হাডসন তার একটু আগেই আচমকা ব্রেক কসে থামলো। গাড়ীটার প্রতি নজর পড়তেই সুজাতা চিনতে পারলো। পরিচিত গাড়ী।

মূলচাঁদ ইতিমধ্যেই দরজা ঠেলে নেমে এসেছেন।

'আরে সুজাতাদি, আপনি পায়ে হেঁটে—'

'সব সময় কি গাড়ীঘোড়া ভাল লাগে মূলচাঁদবাবু,' সুজাতার মুখে শুকনো হাসি, শুকনো ভাষা।

'আমার গাড়ী থাকতে—আসুন আসুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।' মূলচাঁদ সুজাতার জন্যে দরজা মেলে ধরলো।

ঠিক এই মুহূর্তে সুজাতা এরূপ ঘটনা—যাকে সহানুভূতির পর্যায়েও ফেলা যেতে পারে আবার নির্জন বিচরণের প্রতিবন্ধক রূপেও গণ্য করা যেতে পারে—প্রত্যাশা করেনি; কিন্তু এমনি ধরণের লিফ্‌টে সে বহু দিন থেকে অভ্যস্ত। সুতরাং কোন আপত্তি হ'লোনা তার পক্ষ থেকে। হাডসন নিউ মডেল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ধর্মতলা হয়ে চৌরঙ্গী রোড ধরে দক্ষিণে অগ্রসর হতে লাগলো। মূলচাঁদ ড্রাইভারকে স্পীড বাড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন, এবং বললেন, 'এ দিকটায় না এলে যেন প্রাণ ভরে না।'

সুজাতা ছোট্ট হুঁ করলো শুধু।

'আর ঐ আলোগুলোকে, মনে হয় যেন আকাশের তারা।'

মূলচাঁদ দুর্গের দিকের গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা ছোট্ট ছোট্ট আলোগুলো দেখালো আঙুল দিয়ে।

সুজাতার কেন যেন হাসি পেল। হায়রে, মূলচাঁদ আগর-ওয়ালার মনেও কাব্যরস জাগে! আর তাও সহ্য করতে হয়? কিন্তু, মানুষের মন, কাব্য নয়ই বা, কেন? সে ভাবলো। কোন কথা বললো না। বরং অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে।

এদিকে মূলচাঁদের কথার যেন বাঁধ ভেংগেছে। বাঁধ ভেংগেছে বেপরোয়া ভাবে। কারণ, মূলচাঁদ নিজেও সম্ভবত টের পেলেন না কি ভাবে তাঁর আকাশের তারার কাব্য ক্রমে তাঁর নব-আয়ত্ত কণ্ট্রাক্টবিতে পরিণত হয়েছে, কি ভাবে কবিত্ব টাকার থলির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। মানুষের মন। টাকা যেমন কবিত্বের বান ডাকাতে পারে, তেমনি কবিত্বও টাকায় অনায়াসেই নেমে আসতে পারে। কিন্তু সুজাতা একটি বর্ণও শুনতে পেল না। মন তার তখন বহু পরিচিত পথ অতিক্রম করে অপরিচিতের প্রান্তরে এসে নেমেছে।

কিন্তু মূলচাঁদ সুজাতার অন্যমনস্কতা ভাংগালোই শেষ পর্যন্ত। জিগ্যেস করলো, 'আপনাদের মহিলা সমিতির কাজ কেমন চলছে ভাই? অনেকদিন খোঁজ নিইনি কিনা—'

'আমাদের যতখানি সামর্থ্য ততখানি চলছে। তা বুঝতেই পারেন আমাদের করার ক্ষমতাই বা কতটুকু?'

'সে নিশ্চয়, সে নিশ্চয়।' মূলচাঁদ বললেন, 'কিন্তু আমরাও তো দিদি যথাসাধ্য দিচ্ছি, ঠিক কি না বলুন?'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই। আপনারা না থাকলে—'

'কিন্তু অতগুলো শাড়ী কে কে পড়লো দিদি একটাও দেখতে পেলাম না কিন্তু,' বলে মূলচাঁদ হেসে ওঠলো।

সুজাতা যেন চমকে ওঠলো সে হাসিতে !

তাই মূলচাঁদ আগরওয়ালার হাডসন নিউ মডেল সুজাতাকে বাড়ীর সামনে নামিয়ে রেখে গেলেও তৎক্ষণাৎই সুজাতা বাড়ীতে ঢুকতে পরলো না গেটের সামনেই দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ করতে লাগলো। মনে হলো, স্বতন্ত্র পোষাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় মূলচাঁদ এবং পঞ্চানন ঘোষ যেন একই কথা বলতে চায় ; দুজনেরই আবেদন যেন একই সূত্রে এসে মিশে গেল। একই তীর্থে এসে স্নান করতে চায় এরা, একই সাগর সংগমে। রূপ-আকৃতিহীন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি যেন শরীরে দোল খেতে লাগলো। আর পরিচিত-অপরিচিত অনেকগুলো নারীপুরুষের মুখমণ্ডল যেন একসংগে এসে মিলিয়ে গেল।

এদের মিলিয়ে যাওয়ার পর দুটো পুরুষ-মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়ালো—একটা অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের, অপরটা ডাঃ শচীশ সেনের। দাঁড়িয়ে রইলো। একগুচ্ছ কথা আর একগুচ্ছ চিত্র যেন মনে আসতে লাগলো একের পর এক। একদিকে ডাঃ সেন আর অধ্যাপক রায়, এবং অপর দিকে পঞ্চানন ঘোষ ও মূলচাঁদ আগরওয়ালা—এই দুই জোড়া মানুষের তুলনামূলক বিচার করার চেষ্টা করলো সে। বিভিন্ন রং-এ মূর্তিগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো।

অত্যন্ত জটিল এক ভাবানুভূতির আবর্ত সৃষ্টি হলো, সুজাতার মনে। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং ভাবনাহীন জীবনবাদের তাড়নায় সে জানতে চেয়েছিল নিজেকে এবং জীবনকে নবনব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এই জানার মধ্যে নীতিগত কোন প্রশ্ন ছিল না, ছিল না কোন কিছুর অকারণ মর্যাদার স্বীকৃতি, ছিলও না অকেজো আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা। আজ হয়তো শক্তিতে ভাঁটা পড়েছে বলে নিজেকে পূর্বেকার মত বলিষ্ঠভাবে জানা আর সম্ভব হচ্ছে না ; কিন্তু আদর্শ তো তার তেমনি সজীব, তেমনি প্রোজ্জ

ভেসে চলা। এই স্রোতের মধ্যে বহু মানুষকে টেনে না আনতে পারলে অভিজ্ঞতাটা পূর্ণ হয় না। আস্বাদনটায় যেন কিসের অভাব থেকে যায়।

কিসের যেন আহ্বান শুনতে পায় সে। অথচ, সে জানে, নিজেকে সে কিছুতেই দিতে পারে না।

তাহ'লে? বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলো সুজাতা।

আট

এই প্রথম কমলা রায় সুজাতার সংগে শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে গেল, এবং ফিরে এলো একখানা শাড়ী পরে আর দশটি টাকা নিয়ে।

কিন্তু কি যে মনে হ'লো ওর। মোটরে করে যখন ওকে স্টেশনের গেটে নামিয়ে দেওয়া হ'লো তখন যেন প্লাটফর্মের জীবন-নয় অবস্থাটাকেও মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছিল না কমলার। তাহ'লে মোটরের হাওয়া, প্রাসাদোপম বাড়ীর স্নিগ্ধতা, আর দামী বিছানার যে সুবাস তার অংগে লেগে এসেছে তা কি এই জীবন-নয় অবস্থা থেকেও পঙ্কিল? শ্লথ ঔদাসীন্যে পুঁটলিটার ওপর বসে কমলা প্রশ্ন করলো নিজেকে। কারো দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না ওর। দু'হাতে মুখখানা রাখলো সে ঢেকে; যেন কী এক দুরপনেয় কালিমা-কে লেপে দিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। এই কালিমা সে কাউকে দেখাতে চায় না। এই কালিমা নিয়ে সে কাউকে দেখতে চায় না, কিন্তু কি করে এটা সম্ভব্ হ'লো, সে ভাবে।

আর তাও সুজাতাদির কাছ থেকে। জীবনের কত বড় আশ্বাস কত বড় বিশ্বাস বহন করে নিয়ে এসেছিল মহিলাটি। সেই আশ্বাসে যে কোন মেয়ের পক্ষেই আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই, 'সেই বিশ্বাসের পথে পা না দিয়ে থাকা কষ্টকর। কমলাও তাই প্রলুব্ধ হয়েছিল,—জীবন-নয় থেকে জীবনে পৌছানোর আশ্বাসে সায় দিয়েছিল। কিন্তু একি হ'লো? সুজাতাদির জীবন যে এমনি এক দুর্জ্ঞেয় কলঙ্কে আবৃত, মর্যাদাহীন দেহ-নিরঞ্জনে সমৃদ্ধ তা আগে কে কল্পনা করেছিল? কে ভেবেছিল জীবনের আদর্শ ও ধারণা সর্বমানুষের একরকম নয়? কে ভেবেছিল

ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত যত্ন ও মায়া অনুরাগ সিঞ্চন করে কমলা জীবনের যে একটা মধুর চিত্র মনের কোণে গড়ে তুলেছিল বছর বছর ধরে, তা একটা অজানা মুহূর্তের দানব এসে হরণ করে নিয়ে যাবে ?

অথচ, আশ্চর্য, সুজাতাদি মেয়েমানুষ !

এইটেই সবচেয়ে বিস্মিত করলো কমলাকে। নিজেদের সম্পর্কে কেমন যেন একটা প্রত্যয় ছিল কমলার ; অবশ্য যুক্তি দিয়ে কখনো বিচার করে দেখেনি সে, তথাপি প্রত্যয় একটা ছিল, আর সেজন্যই যতসব অরুচিকর গর্হিত ব্যাপার ঘটে যায় সময় সময় সেজন্য সে পুরুষদেরই দায়ী করতে অভ্যস্ত ছিল। আর সুজাতার মত নিজেকে নয় অন্যকে এই পথে অগ্রসর করে দেওয়ার কল্পনা তো মরলেও আগে করতে পারতো না। কিন্তু জীবন সম্পর্কে তার আদরে-গড়া চিত্রের মত, নারী চরিত্রের ঐ পবিত্রতার কথাটাও সহজেই মন থেকে মুছে গেল। সে মর্মে মর্মে আজ উপলব্ধি করলো সে এক নতুন পৃথিবীতে পা দিয়েছে ; আর নতুন বলেই সম্ভবত এই পৃথিবীটা তার পুরোনো ধারণার বিচারে বীভৎস।

এতদিন সে যে সমস্ত মহিলার আনাগোনা দেখেছে স্টেশনে, তাদের সকলের আসা-যাওয়াটাই আজ একটা নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়েছে কমলার মনে। এত হাসিভরা উৎসাহভরা আশ্বাস ও দরদের রহস্য যেন সে ধরতে পেরেছে। আর জীবন-নয় অবস্থায় পড়ে থাকা যে সব মেয়েদের চলাফেরা করতে দেখেছে আগে, তাদের চলাফেরার ইংগীতও আর গোপন নেই, কিন্তু এদের সকলেই কি এইরূপ ? কথাটা ভাবতেও যেন কেমন খটকা লাগে। তা হয়তো নয়, কিন্তু তথাপি কমলা আর আস্থা স্থাপন করতে পারছে না কারো ওপর।

অথচ, আশ্চর্য, এরা সকলেই মেয়েমানুষ !

নিজেকেও যেন সে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। মনের এমনি অবস্থায় কমলা ফিরে চলার টান অনুভব করে। কিন্তু কোথায়? বুঝতে পারে না ঠিক। আর অনুভব করে একটুখানি আশ্রয়ের একটুখানি অবলম্বনের আকুতি কত তীব্র হ'য়ে মনের গভীরে যেন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠছে। কত সুতীব্র বেদনায়, কত নিঃসঙ্গ হাহকারে। পৃথিবীতে কেউ কি নেই সত্যাই আশ্রয় দেওয়ার? নেই কি একটুখানি মাটি?

বারবার অমিয় দাসকে মনে পড়তে লাগলো কমলার, হ্যাঁ, অমিয় দাসকে, যার নাম সে আগে জানতো না। সেই দিনের উদ্ধত প্রত্যাখ্যানের পর ওদের দলীয় কর্মীদের কাছে কমলা নাম জেনে নিয়েছে অমিয়র। আজকের কলুষভরা অভিজ্ঞতার মাঝখানে আক্ষেপ হ'তে লাগলো তার কেন সে সাহায্যের ঔদার্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর শুধু প্রত্যাখ্যানই নয়, এমনি কেন যেন মনে পড়তে লাগলো, অমিয়র চলে-যাওয়া দৃঢ় পদক্ষেপের সংগে দৃষ্টিটা কী অজানা আকর্ষণে লেগে থাকতে চাইছে যেন। মিশে যেতে চাইছে যেন। কেন যে এমন মনে হ'তে লাগলো কমলা বুঝতে পারলো না। তবু মনে হ'তে লাগলো, মিশে যেতে লাগলো।

প্রশ্ন জাগলো তার মনে, অমিয় জীবনের বা সাহায্যের যে পথ তুলে ধরতে চেয়েছিল, তা কি সুজাতার দেওয়া জীবন থেকে কম মূল্যবান ছিল? তা কি বিকিকিনির সম্পর্কে কালিমাখা ছিল? ঠিক মূল্যের মানদণ্ড দিয়ে যেন সে দুটো জিনিসের বিচার করতে পারলো না; কিন্তু মনে হ'লো দুটোর জাত যেন ছিল আলাদা। তাই সে বাড়ীর দামী-বিছানার সুবাস যখন তার সমস্ত দেহকে গ্রাস করে চলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে অমিয়কে মনে হয়েছিল তার, তার

সমস্ত চলে-যাওয়া মূর্তিটা জেগে উঠেছিল চোখের সামনে। সে ভয় পেয়েছিল তখন।

অথচ অমিয় পুরুষ, আর সুজাতা মেয়ে!

এমনি ধরণের কতো আত্মক্ষয়ী চিন্তা, কত অসংলগ্ন কথা তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখলো সারাদিন, সারাক্ষণ; অর্থাৎ, যতক্ষণ না ক্লান্ত ঘুম নেমে এল একটুখানি চোখে, ততক্ষণ সে চিন্তা করলো। বহুবার বহুবিধ সংকল্পে মন তার শক্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু জীবন-নয় অবস্থায় পড়ে-থাকা মানুষের সংকল্প ভেংগে যেতে বিন্দুমাত্রও সময় লাগেনি। আবার, তেমনি বন্যাস্রোতে অসহায় ভাবে ভাসতে ভাসতে কোন একটা বাঁধের সাক্ষাৎও পেয়েছে সে, দেহ-মন আশ্রয় পেয়ে শক্ত হ'য়ে বসেছে। এমন অবস্থায় যখন মনের হালকা ফাঁক-গুলো পরিপূর্ণ হয়ে ভরে উঠেছে, তখন অজস্র সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়েছে তার মন; মনে হয়েছে, সুজাতাদির পথ বোধ করি চির-কালের জন্যই তার জীবনে বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, পরদিন যখন ঠিক তেমনিভাবে পুনরায় আহ্বান এলো, এবং সাড়া না পেয়ে তা ফিরে যাচ্ছিল, তখন কমলার মনে হ'লো কি যেন তাকে ভেতর থেকে ঠেলে দিচ্ছে সামনে, কি যেন অস্থির ভাবে দাপাদাপি সুরু করেছে ভেতরে। তারই আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে ছুটে গিয়ে গ্রহণ করলো সেই ফিরে-যাওয়া আহ্বানকে, সমর্পণ করলো নিজেকে। আর ফিরে এসে পুনরায় একই ধরণের কথাই ভাবতে লাগলো; একই ধরণের সংকল্প গ্রহণ করলো, আবার একই ভাবে তা ভাঙলো।

কিন্তু অবস্থাটা অসহ্য বোধ হ'তে লাগলো দুদিনেই। কেননা, দু'দিক খেলাতে পারলো না সে; দু'দিক, অর্থাৎ দেহ আর মনকে

একই তীর্থে বাঁধতে পারলো না। কিছুতেই পারলো না। পৃথক পথে যেন ছিটকে পড়লো এরা, দুটো পৃথক সত্তায় ভাগ হ'য়ে গেল। আর দুদিকেই যেন সুতীব্র বেদনা, দুঃসহ জ্বালা। আর দুটো সত্তায় ভাগ হ'য়ে গিয়েছে বলেই যেন আর সামলাতে পারছে না কিছুতেই। অসহ্য, অসহ্য।

এমনি অবস্থায় অকস্মাৎ যেন নতুন আলোক পেল সে। কিন্তু কথাটা মনে হ'তেই সে সঙ্কুচিত করে নিল নিজেকে। না, নিজের কলুষকালিমা নিয়ে সে অমিয়র মুখের দিকে তাকাতে পারবে না, কিছুতেই না। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার পর অমিয়কে কোনও ভাবে তার জীবনের পরিধির মধ্যে টেনে আনা যেন অমিয়কে অপমান করার মত শোনালো কমলার। সংশয় দ্বন্দ্বে দুলতে লাগলো সে।

কিন্তু আশ্চর্যভাবে এই সংশয়ের মীমাংসাও হয়ে গেল, এবং অমিয়র সহায়তায় সত্য সত্যই সে একদিন বাপ মা ছোট ভাইদের নিয়ে নিবারণ সাহাদের কলোনীতে ঘর বাঁধতে লাগলো।

এই নতুন বাড়ী, আর পূর্ব-বাংলায় ফেলে-আসা বাড়ী, আর এই দুই বাড়ীর মধ্যবর্তী শিয়ালদা স্টেশনে পনের দিনের জীবন, তারও আবার শেষের দু'দিনের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়, কমলার জীবনে কোন্ অধ্যায়ের কি গুরুত্ব ও মূল্য তা মনে মনে নির্ধারণ করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু সে বুঝতে পারে কোন কিছুর স্পষ্ট মীমাংসা করার শক্তি তার নেই। তথাপি সমগ্র জিনিসটাকে একটা বিচিত্র মায়ার স্পর্শে আর জীবন-নয় অবস্থা থেকে জীবনে যাওয়ার আকুতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে সে। অবস্থা আর তার কার্যক্রমকে যুক্তিবহ করার চেষ্টা করে।

আর সবাই মিলে ঘরের বেড়া বাঁধে, নতুন ঘর।

শিয়ালদা স্টেশনের ওপর মানুষের এত দিনকার হালকা দৃষ্টিটা সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেছে। এখানে এক অভাবনীয় পণ্যের খেলা চলেছে; একথাটা হাওয়ায় ভর করে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। বহু মানুষ উৎকণ্ঠায় এই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদ নেয়, হয়তো মন আক্রোশে ফুলে ওঠে, কিন্তু এর বেশী আর শোনা যায় না কিছু। স্টেশনে সেবার ও বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সতর্ক সজাগ দৃষ্টিতে চোখ ফেরায় স্টেশনের সর্বত্র। কিন্তু পণ্যের বেচাকেনার কারবারিরা এদের চেয়ে বহু অংশে বুদ্ধিমান। তাই ওদের সতর্ক চোখও অভিজ্ঞতার অভাবে বিশেষ কিছু করতে পারে না। নিজেদেরই ডাইনে বাঁয়ে সেই খেলার চক্ররেখা সর্পিল ভংগীতে চলে গিয়েছে; অথচ ঠিক ধরতে পারে না, এত কাছে থেকে মনে হয় যেন সেটা অসম্ভব। কেউ বুঝিয়ে দিলে আশ্চর্য হয়, ভাবে, এই কালো পৃথিবীর সংগে পরিচয় এখনো ওদের ঘনিষ্ঠ হয়নি।

আবার সেবার নাম করে বহু ধরণের কুকীর্তিও চলছে। কারণ, অকল্যাণটাকে চোখে দেখতে পেলে কেউ তাতে আকৃষ্ট হয় না, তাই একটা আবরণের প্রয়োজন হয়। এমনি আবরণ ও ঢাকাঢাকিও যে স্টেশনের বুকে না চলেছে তা নয়। তাই সর্বদিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করা হয়েছে এক মহামুস্কিলের ব্যাপার। সেটা ডাঃ সেনের পক্ষে যেমন, তেমনি তাঁর মত আদর্শবাদী অন্যান্য কর্মীর পক্ষেও সত্য।

পূর্ব-পশ্চিম বাংলার সামাজিক জীবনের এমনি একটা মর্মান্তিক অবস্থায় যে খেলা চলেছে স্টেশনের বুকে, তাকে বন্ধ করা না হোক অন্ততঃ কোনও ভাবে নিন্দনীয় করা যায় কিনা সে চেষ্টা ডাঃ সেনের। তাই কদিন ধরে তিনি নিজেও সাধ্যমত নজর রাখতে

আরম্ভ করেছেন সেখানে। এই কদিনের প্রচেষ্টায় দৃষ্টি একটু ফর্সাও হয়েছে তাঁর। কিন্তু ফর্সা হয়েই যেন হয়েছে আরও বেশী মুস্কিল। কেন না, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তাঁর হাত-পা যেন বাঁধা। ইচ্ছে করলেই সবাইকে তিনি শাস্তি দিতে পারছেন না। কেন না, তাঁর থেকেও প্রভাবশালী হস্তের সংগোপন ইংগিত রয়েছে সেখানে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, কোথা থেকে কার নির্দেশে ঐ হারাণের মত একটা পশু এখানে পণ্য ক্রয়ের জন্যে প্রত্যহ আসে যায়, ক্রয়ও করে, অথচ একে-শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁর। চোখ বুজে থাকতে হয়, নিশ্চিত ঔদাসীন্যে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়।……ঐ হারাণটা! আঃ কী নিশ্চিন্ত আরামে বিড়ি ফুঁকছে, আর স্টেশনের সেপাইটার সংগে অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে গল্প করছে। পিঠের চামড়া তুলে ফেলতে ইচ্ছে হয় তাঁব। কিন্তু দুঃখের অথবা ক্ষোভের হ'লেও একথা সত্যি যে, এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে হারাণের ক্ষমতা বেশী।

এই চেতনা, হারাণ তাঁর চেয়েও বেশী শক্তিধর,—যে তাঁর পক্ষে কত লজ্জাকর, কত অবমাননাকর তার পরিমাপ করতে পারেন না ডাঃ শচীশ সেন। দুঃখও হয়, আবার রাগও হয়। রাগে যেন মাঝে মাঝে কাঁপে তাঁর শরীর। কিন্তু, তথাপি, উপায় নেই কোন।

এমনিভাবে এ যেন একটা গভীর সমস্যার মত দেখা দিল তাঁর মনে। গভীর সমস্যার মত। তাঁর আদর্শ আর তাঁর নীতিবোধ এতকাল তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছে, তাকে বাঁচাতে হ'লে সমস্ত অদৃশ্য প্রভাব ও ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে শাস্তি দিতে হয় সম্মুখে প্রসারিত এই পাপকে। কিন্তু পাপকে তিনি শাস্তি দিতে পারেন নি, কার্যত শ্রদ্ধা করেছেন সেই অদৃশ্য প্রভাবকে; অর্থাৎ খণ্ডিত করলেন

তাঁর আদর্শকে। কিন্তু, এতে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও কি খণ্ডিত করা হ'লো না? তিনি জিজ্ঞেস করেন নিজেকেই। একি পরিণতি হ'লো তাঁর আদর্শের, তাঁর ব্যক্তিত্বের, যে সহজ সরল রেখায় তার মর্যাদা রক্ষা সম্ভব হ'লো না?

অথচ, তিনি জানেন, এই পাপ একদিন ধরা পড়বেই। যে শ্রদ্ধা সম্ভবত তা মূল্যহীন) তিনি দেখিয়েছেন যবনিকার অন্তরালে ঢাকা শক্তিকে, সে শ্রদ্ধা অন্য আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীরা করবেই বা কেন? তাদের হাতে যেদিন এই পাপ শাস্তি গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবে, এবং যেদিন দেশময় রাষ্ট্র হবে যে অন্তত খাতায়পত্রে তাঁরই মত আদর্শে বিশ্বাসী এবং জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা বলে আখ্যাত ব্যক্তিরাও এই কেনাবেচার অংশীদার, তখন? তখন লজ্জা ঢাকার স্থান পাবেন কোথায় ডাঃ শচীশ সেন? কংগ্রেসের আদর্শবাহী এবং কংগ্রেস সেবাসংগঠনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ শচীশ সেন। তাঁদের সংগে সংগে কালিমাটা কি তাঁর মুখমণ্ডলকেও মলিন করবে না।

জীবনে এমনি ধরণের অবস্থা যেন আর কখনো আসেনি। অর্থাৎ, আদর্শ ও ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে এমনি ধরণের বৈষম্য আর কখনো দেখতে পাননি তিনি। তাই আজ মনে হচ্ছে, যেন একটা সংকট নেমে এসেছে কোথা থেকে। অথচ ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাতে সংশ্লিষ্টও নন। হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাকে অপরাধী করা যায় না, তাঁর ও এদের পারস্পরিক জীবনের সংযোগও প্রত্যক্ষত কিছু নেই; আর এদের জন্য তাঁর দরদেরও অভাব নেই কোন। অথচ আজ এদের জীবনকে কেন্দ্র করেই যেন একটা সংকট সমুপস্থিত হয়েছে তাঁর

জীবনে, যে সংকট তাঁর আদর্শের, ব্যক্তিত্বের, তাঁর চরিত্রের। এই সংকটকে জিইয়ে রেখে চলাও অসম্ভব ব্যাপার।

অবশ্য আর পাঁচজনের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এটা বিন্দুমাত্রও সংকট বলে গ্রাহ্য হ'বে না। কিন্তু আর পাঁচজনের দৃষ্টি আয়ত্ত করা ডাঃ সেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পাকচক্রের মধ্যেও দৃষ্টিটা তাঁর নিজস্ব, একক। তাই তাঁর কাছে সংকটময়, মর্মান্তিক।

স্টেশনে এদিক সেদিক চলাফেরা করতে করতে ডাঃ সেন এই কথাই ভাবেন। ভাবেন, কিভাবে জয় করা যায় এই সংকটকে।

'কি হয়েছে? কি হয়েছে?' বলে অমিয় দাস ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল।

তিন-চারজন লোককে কেন্দ্র করে পঁচিশ-ত্রিশ জন লোকের একটা ভিড় জমে উঠেছিল। মধ্যেকার একটি লোকের ওপর এদিক সেদিক থেকে কিলটা ঘুঁষিটাও বর্ষিত হচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে অবৈধ গালিগালাজও উচ্চারিত হচ্ছিল দু'একটা। অমিয় ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল ওদের সংগঠনের কর্মী মণ্টু ও আরও দু'টি স্বেচ্ছাসেবক একটি যুবা বয়সী লোককে ধরে রেখেছে, এবং চেহারা ও ভাবভংগীতে বোঝা গেল উপস্থিত আক্রমণের পাত্র এই লোকটী ই। অমিয়কে দেখেই মণ্টু বলে ওঠলো, 'এ ঘুষ নিচ্ছিল, অমিয়দা।'

'ঘুষ নিচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, বাবু, এই আমার কাছ থেকে।' মণ্টুদের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা শরণার্থীটি বললো। অমিয় চকিতে দেখে নিলো বক্তাকে।

লোকটি বলছিল, 'ইনি আমাকে বোঝালেন আমাকে ভাল ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন, গভর্ণমেন্টের সাহায্যে রেশন কার্ড বাড়ীঘর ওঠানো ইত্যাদি সব করিয়ে দেবেন। বুকের ওপর টিকিট দেখে আমি ভাবলাম সত্যই বুঝি বা হ'বে, গরীব লোক, যদি উপকার হয়তো ভালই। এই ভেবে আমি টাকা দিচ্ছিলাম—পঁচিশ টাকা বাবু—অমনি ইনারা দেখে ফেললেন', বলে মণ্টুদের দেখিয়ে দিলো সে।

অমিয় আততায়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘুষ নিচ্ছিলে তুমি?'

কোন উত্তর নেই। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। অমিয় লক্ষ্য করলো কানের ও কপালের কোণে আঘাতের চিহ্ন ফুলে উঠেছে। বুঝতে বাকী রইলো না কিছু। উপস্থিত শাস্তিটা পর্যাপ্ত রকমের হয়েছে মনে করে অমিয় ছেড়ে দিল তাকে। বললো, 'লজ্জা সরম থাকে তো এপথে আর যেওনা, বুঝলে? যা—ও।'

ডাঃ সেনও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই জটলার প্রতি। কিন্তু দূরে থেকে নিজেকে একটু বাঁচিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সদ্য-মুক্তি পাওয়া অপরাধীর বুকে আঁটা ব্যাজটা দেখে যেন সংকুচিত হয়ে গেলেন তিনি; দৃষ্টি অবনত করে অন্যদিকে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

অতটা সহজে যেন ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না মণ্টুদের। তাই প্রথমটায় যেন হতাশ হ'লো ওরা, তারপর এই অনভিপ্রেত অবস্থাটাকেই মেনে নিয়ে ওদের কে একজন বললো, 'খবরের কাগজে রিপোর্টটা দিতে হ'বে কিন্তু আজই; খুব মজা হবে।'

অমিয় ধমকের সুরে বললো, 'হু' বুদ্ধিমান সব। যাও যাও কিছু করতে হবে না। এর কাছ থেকে একটা রিপোর্ট নিয়ে একে ছেড়ে দাও।' অমিয় তার পার্টিটিকে ইশারায় দেখিয়ে দিলো।

আর সবাই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মণ্টু ফিরে তাকিয়ে বললো, 'কিন্তু অমিয়দা ও তো কং—'

'হলই বা।'

'তাহ'লে—?'

'কি তাহলে ?'

'তাহ'লে কেন আমরা কাগজে রিপোর্ট দেব না ?'

'ওতো ভলান্টিয়ার।'

'বাঃ —' মণ্টুর চোখেমুখে প্রশ্ন।

'ভলান্টিয়াররা ঘুষ খায়, একথাটা রাষ্ট্র হলে তোদেরই খুব মান বাড়বে নাকি, এ্যা ?'

সুজাতা মুখার্জি আর কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারলো না। এক সময়ে অমিয়র সংগে চোখাচোখি হয়েই গেল।

'নমস্কার সুজাতাদি।'

'হেঁ হেঁ কেমন আছ ভাই, চমৎকার কাজ হচ্ছে তোমাদের।' সুজাতা খুব অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে তার শুকনো হাসি, যা সমস্ত অন্তরঙ্গতার প্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে উঠেছে, আর যা ভেতরের একটা শঙ্কাগ্রস্ত মনকে তুলে ধরছে সম্মুখে।

অমিয় উত্তর দেয়, 'আপনাদেরও খুব চমৎকার কাজ হচ্ছে, খুবই চমৎকার—'

সুজাতা যেন একটু চমকে ওঠে, অমিয়র স্বরে কি বিদ্রূপ ? তথাপি অবস্থা হাল্কা করে এবং কথাটা গায়ে না মেখে সুজাতা উত্তর দেয়,

'আমাদের কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমাদের কর্মীই বা কোথায়। তোমাদের মত কর্মী থাকলে—'

'কি যে বলেন সুজাতাদি, আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা।'

সুজাতা যেন সত্যই বিপদে পড়লো। বললো, 'না ভাই সত্যি, সবাই তোমাদের খুব প্রশংসা করছে।'

'আমার কিন্তু পাল্টা আপনাদের দেখেই হিংসে হয়—'

'হয়েছে, হয়েছে—' সুজাতা হাল্কাভাবেই গ্রহণ করে কথাটা।

'না, না, সত্যি, দিনরাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিফিউজিদের মধ্যে কাটানো—এটা কি কম কথা বলছেন?'

'তুমি ঠাট্টা করছো অমিয়।'

'ঠাট্টা? পাগল। আমি ঠাট্টা করতে পারি আপনাকে? আপনার মত এমন অর্গানাইজার পেলে—'

'সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগেনা অমিয়।' সুজাতার মুখ থেকে ততক্ষণে শুষ্ক হাসির রেখাও মিলিয়ে গিয়েছে।

'সত্যি বিশ্বাস করুন, ঠাট্টা করছি না আপনাকে। আপনার মত অর্গানাইজার ক'জন আছে বলুন?'

সুজাতা চটেই গেল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। হনহন করে যেতে যেতে বললো, 'এত ঠাট্টা ভাল নয় অমিয়।'

সুজাতার চলে যাওয়ায় অমিয় হেসে ওঠলো প্রাণভরে। বললো, কি ভাল, বলে দেবেন সুজাতাদি?'

হারাণদা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ করেনি বলে গভর্ণমেণ্টের নিন্দে করেছিলেন। সম্প্রতি প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছেন। তবে

তা সম্পূর্ণ অন্ধ কারণে। শিয়ালদা স্টেশনে যে অভিনব পণ্যের ক্রয় বিক্রয় চলেছে, তাতে কেনা বেচার মাধ্যম হিসেবে বেশ একটু সুবিধে করে নিয়েছেন হারাণদা। উপস্থিত তাতে সর্বদিক থেকে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। প্রশংসার কারণ বোধ হয় এই সুযোগটা।

যাই হোক আজ নতুন দুজন সংগ্রহ করেছেন তিনি। তার হাতে তো আর খদ্দেরের অভাব নেই। চুনোপুটি থেকে আরম্ভ করে মায় মন্ত্রী পর্যন্ত, সর্ব মহলেই তার আদর। কারণ, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় পাকা লোক তিনি। আর এসব জিনিস্ কচলাতে কচলাতে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আজকাল যে কারো কোনোরকম তোয়াক্কা রাখেন না তিনি। তাছাড়া পেছনে জোরও তো কম নয়। যাকে তাকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তার, একথাটা সবাই যেন স্মরণ রাখে। এমনি ভাবে চলাফেরা করেন তিনি।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই যথাস্থানে পণ্য পৌছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে স্টেশন থেকে যাত্রা করলেন হারাণদা। সংগে সেই দুটি মেয়ে যারা এই সদ্য নিজেদের বিক্রয় করেছে। স্টেশনের সংলগ্ন প্রশস্ত পথে বহু শত মানুষের যাতায়াত, বহু গাড়ী ঘোরার চলাফেরা, অসংখ্য ট্যাক্সির হর্ণ আর দূর থেকে আসা ট্রাম-বাসের চীৎকার ও যাত্রীদের কোলাহল উপেক্ষা করে প্রতিদিন কত যে বিচিত্র ইতিহাস অলক্ষ্যে নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে, কে তার হিসেব রাখে, বা কে তার জন্য মাথা ঘামায়। ঠিক তেমনি ভাবে অনেক হারাণদা মিলে যে নতুন কাহিনী রচনা করছে তার সংবাদও কেউ রাখে না; মানুষ যায় আসে শুধু আসা যাওয়ার জন্যই আসে যায়। সাধারণের চোখে আর সব মানুষদের মতই হারাণদাও যায় আসে। শুধু এই মাত্র......হারাণদা গেটের দিকে অগ্রসর হতে হতে

সঙ্গিনী দুটিকে বেশ একটু মিঠে করে বললেন, 'দেখিস ভাই, আমাকে কিন্তু ভুলিসনি।'

কিন্তু গেট পার হওয়ার ঠিক আগটাতে কে যেন আচমকা পেছন থেকে সার্টের কলার ধরে টেনে ধরলো হারাণদার। আর 'কে রে শা,—' বলে যেই হারাণদা ফিরে দাঁড়াতে গেলেন, অমনি প্রচণ্ড একটা ঘুসিতে যেন মাথাটা ঘুরে গেল হারাণদার। আরো দু' একটা, আরো দু' একটা আঘাত এখানে সেখানে অনুভব করলেন হারাণদা। সমস্তটা পৃথিবী যেন হঠাৎ ঘুরতে আরম্ভ করেছে। মেয়ে দুটো ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু শিয়ালদার পথে চলা এবং কোন কিছুর ধার না ধারা লোকগুলোই এলো হারাণদার সাহায্যে। কি হলো, কি হলো বলে এক ঝাঁক লোক ছুটে এলো, এবং এই হঠাৎ আক্রমণের বেসামাল আঘাত থেকে রক্ষা করলো হারাণদাকে।

হারাণ একটু স্থির হয়ে দাঁড়ানোর ফুরসৎ পেলেন, কিন্তু অনুভব করলেন দুতিন জনায় ধরে রেখেছে তাকে। নড়তে ইচ্ছে হলো না, সাহস ও হলো না কিন্তু চোখাচোখি হলো সামনের ছেলেটির সংগে। কোথায়, কোথায় দেখে থাকবেন তাকে? হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখে থাকবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে এবার। এই সেই ছেলে যে একদিন স্টেশনের বুকে দাঁড়িয়েই ডেপোমি করেছিল তার সংগে। আজ তার বুকে পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটির ব্যাজ। 'কি করেছে মশাই?' কে একজন জিগ্যেস করলো।

মন্টুরা নয়, অন্য কে একজন উত্তর দিলো, শালা মেয়ে চোর, চুরি করছিল। উত্তর শুনে ক্রমবর্ধমান জনতার কেউ হাসলো, শ্লেষ-মেশানো হাসি; কেউ ঘৃণায় থুথু ফেললো; কেউ অশ্লীল গালি দিলো দু' একটা; আর কেউ বা আরও কয়েক ঘা বসিয়ে দেবার সুপারিশ করলো; আর কেউ ব্যাপারটা একেবারেই কিছু নয় এমনি ভাব করে সরে

গেল। এক দুটো ঘুষি বা কিল যে হারাণদাকে অতিরিক্ত সহ্য করতে হলো না, তাও নয়। কিন্তু তথাপি একটুখানি সাহস সঞ্চয় করে তিনি প্রতিবাদ করলেন, 'মিছে কথা, ডাহা মিছে কথা—'

মণ্টু কটমট করে তাকালো হারাণদার দিকে। জনতার মধ্যে পুনরায় হাসির তরঙ্গ খেললো। কে একজন মন্তব্য করলো, আহা বেচারা— ! হারাণদা আবার বললেন, 'এই জিগ্যেস করুন না ওদের, আমি যাচ্ছি আমার পথে ওরা ওদের পথে, মাঝথেকে এরা মশাই আমাকে মারধোর করেছে—আমি এক্ষুণি থানায় যাব, আমি এর প্রতিকার না করে ছাড়ব না দেখে নেবেন— ।'

'ওরে আমার বড় সায়েবরে,—' কে যেন তারিফ করলো। কিন্তু অপমান গায়ে মাখার সময় ছিল না হারাণদার। মাথার আঘাতটা থেকে রক্তই পড়ছে সম্ভবত। বললেন, 'কিগা সব ন্যাকা সেজে আছ কেন এখন—বলতে পার না নিজেরা······ভলান্টিয়ার হয়ে যায় তার গায়ে হাত দেওয়া, এর মজা আমি টের পাইয়ে দেব। আমার নাম—' এই বলে হারাণদা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন নিজকে ছাড়িয়ে নেবার, কিন্তু আরও বেশী যেন আটকা পড়লেন বলে মনে হলো, সত্যই পড়লেনও।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে অমিয় এসে গিয়েছিল। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে সে ওদের কর্মীদের নির্দেশ দিলো, নিয়ে চল একে, পুলিশে দিতে হবে। বদমায়েসী ছুটিয়ে দিতে হ'বে।'

'অমিয়, শোন।'

অমিয় ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো ডাঃ শচীশ সেন দাঁড়িয়ে। কংগ্রেস সেবা-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রেও এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছেছিল। ডাঃ সেন স্বয়ংই এর তথ্য সংগ্রহে এসেছেন। হারাণকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে অপরিসীম আনন্দ হয়েছে তাঁর; নিজের আপ্রাণ ইচ্ছা

থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব হয়নি, সেই কাজ অমিয়রা করতে পেরেছে দেখে কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠলো। প্রশংসা করলেন এদের কর্মক্ষমতাকে। কিন্তু, তিনি জানেন, হারাণের শক্তির উৎস কোথায়, কার ইংগিতে এই কেনাবেচার পাট চালিয়ে যাচ্ছে সে। তিনি আরও জানেন, পুলিশ হারাণকে স্পর্শ করতে পারবে না, বরং যারা হারাণকে পুলিশের জিম্বায় দেবে, পাল্টা তাদের গায়েই পুলিশের হাত ওঠা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে। তাই, এদের প্রতি দরদেই এই ব্যাপারটার মীমাংসা এখানেই সেরে ফেলতে চান, তিনি।

অমিয়কে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে তিনি বুঝালেন ব্যাপারখানা; এবং শেষে বললেন, 'বুঝলে তো ভাই সব কাণ্ডকারখানা; তাই এখানেই সেরে ফেল এটা। বরং আরো দু'চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও।'

কংগ্রেসের প্রতি স্বাভাবিক যে অশ্রদ্ধা আছে সকলের, তার দৃষ্টিকোণ থেকে অমিয়র প্রথমটায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ডাঃ সেনের কথা। কিন্তু সততা সম্পর্কে ডাঃ সেনের যে সুনাম আছে, তার ওজনে সমস্তটা বিচার করে অমিয় তাঁর নির্দেশই পালন করলো। ছেড়ে দিলো সে হারাণকে; কিন্তু বলে দিলো, 'যদি আর কখনো একাজে দেখিতো রক্ষে থাকবে না বুঝলে?'

কিন্তু ছাড়া পেয়েই স্বরূপ প্রকাশ পেল হারাণের। রীতিমত ত্রস্ত পদক্ষেপে চলে যেতে যেতে বললেন তিনি, 'এইতো সাহস, কৈ, পারলি আমায় পুলিশে দিতে?......কিন্তু এর শোধ যদি আমি না নিই আমার নাম হারাণ দত্তই নয়।'

অপস্যয়মান জনতার কে একজন বললো, 'শালার ফুটানি দেখ না।' পুনরায় হাসির তরঙ্গ খেলে মিলিয়ে গেল।

এই আকস্মিক ঘটনাকে অবলম্বন করে স্টেশনের চারিপাশের জীবন যেন থেমে গিয়েছিল; অর্থাৎ এইটুকু জায়গায় বাইরের কোন কোলাহল যেন আর প্রবেশ করছিল না। কিন্তু এই ঘটনার শেষ হওয়ার সংগে সংগেই পুনরায় সজীব হয়ে উঠলো সেই জীবন। ট্যাক্সির হর্ণ, রিক্সার টুং টাং, ট্রামবাসের কোলাহল আবার শোনা যেতে লাগলো। জনতা ভেংগে গেল, প্রত্যেকটি মানুষ মিলিয়ে যেতে লাগলো সীমাহীন জনস্রোতে। মানুষের গলার আওয়াজ তলিয়ে গেল কোলাহলে।

কিন্তু বাদ সাধলো সেই মেয়ে দুটি। কিছুতেই ওরা জনস্রোতের সংগে মিশে যেতে চাইলো না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, ফিরেও যেতে চাইলো না নিজের নিজের জায়গায়।

খুব স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলো অমিয়, 'কিছু লাভ হ'বে না এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কেন মিছিমিছি—'

'বলেছি তো যাব না।' বেশ সংযতকণ্ঠেই জবাব দিলো ওদের একজন।

'মানে?'

'মানে আবার কি। যাব না যাব না। কেন আটকাতে চান আমাদের, কি অধিকার আছে আপনাদের?'

কথার ঝাঁঝটা মুহূর্তের জন্য স্মরণ করিয়ে দিলো কমলাকে। অমিয় বিস্মিত হ'য়ে ভাবলো, ওরা সকলেই কি এক ধাতুতে গড়া? কিন্তু এমনিতে ছেড়ে দিতে পারলো না সে। ওদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য মণ্টুদের নির্দেশ দিয়ে সে চলে গেল।

মেয়ে দু'টি নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

নয়

এক চোখে শ্রদ্ধা এবং আরেক চোখে বিরক্তি নিয়ে অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছিল অরুণা। বিরক্ত হয়েছিল সে রায়ের কথা বলাব ভংগীতে, এবং যে আদর্শ অধ্যাপক রায় তার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাব প্রতি। নিজের মন ও মানসের সংগে কেমন যেন একটা ব্যবধান অনুভব করেছিল অরুণা। কিন্তু তথাপি কেন যেন ভাল লাগলো তাঁর স্তুতিবাদকে। রায়ের মুখে অরুণার শিল্পকলা ও শিল্পীজীবনের প্রশংসার মধ্যে এমন একটা আমেজ ছিল, যার প্রতি সে আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি বা পারে না, এবং যে কথাগুলো বার বার মনের মধ্যে তাদের অধিকার বিস্তার করেছিল। অবশ্য শ্রদ্ধাই হোক বা ভাল লাগাই হোক, অরুণা স্থির নিশ্চিতভাবে জেনে নিয়েছিল যে, রায়ের বাড়ীতে তার যাওয়া সেই প্রথম এবং সেই শেষ। কেননা, অরুণার মনে হয়েছিল, সেই আবহাওয়ায় সে পাখা তুলে উড়তে পারবে না, অথবা অনুভূতির বিস্তাবও লাভ করবে না সে। আর শ্রদ্ধা বা ভাল লাগা, এ সব জিনিস দূরে থেকেই মানায় ভাল, মাখামাখিতে তাব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়; হয়তো বা শ্রদ্ধা ঘৃণায় পরিণত হয়। অকারণ মাখামাখিকে মনে স্থানও দেয়নি সে।

কিন্তু, সেদিনের পর থেকে অধ্যাপক রায় যেন অরুণা সম্পর্কে একটু বেশী রকমের আগ্রহশীল হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য সূত্র থেকে অরুণার কানে সে সংবাদ এসে পৌছেছে। আর ক্লাশেও ওর প্রতি দৃষ্টিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় পড়তে আরম্ভ করেছে, আর নিষ্প্রয়োজন

'বুঝতে পেরেছো' বলার ধুম পড়ে গেছে। সহপাঠী ও পাঠীনীদের মনোযোগও এই নতুন পরিস্থিতিটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। একটু লঘু হাসাহাসিও রসঘন রহস্যালাপের মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হ'তে লাগলো। অবশ্য এ রহস্য রহস্যই, তা গায়ে মাখলে অরুণার চলে না।

অধ্যাপক রায় কিন্তু বেশ নিশ্চিত ভাবেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। একদিন কলেজের বারান্দাতেই আরো কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সামনে অরুণাকে বললেন তিনি, 'তোমার ব্যাপারখানা কি বলো তো? তোমার বৌদি বার বার তোমার কথা বলছেন কেবল। যাচ্ছ না কেন, গেলে কি এমন ক্ষেতিটা হয় বলো তো?'

অরুণা কোন উত্তর দিলো না। কিন্তু এমন লজ্জা হ'লো—। বিরক্তও হ'লো সে, কিন্তু এই বিরক্তির মধ্যেও মনে পড়লো পুরোনো প্রশংসার কথাগুলো। একটু ভালও লাগে যেন, হ্যাঁ, ভালও লাগে।

মনের এই অবিন্যস্ত ভাবরাশিকে এমনি অবিন্যস্তভাবে বেশীদিন চলতে দেওয়া উচিত হ'বে না বলে মনে হ'লো অরুণার। তাই এর প্রভাব লাঘব করার জন্য ওদের রাজনৈতিক ও রিলিফের কর্মে একটু অধিক নজর দিলো সে। ক'দিন বেশ কেটে গেল। কিন্তু, এই কেটে যাওয়ার মধ্যেও কলেজের পরিবেশে সেই অসংগঠিত ভাবগুলোই পুনরায় দেখা দেয়, মনকে, অদ্ভুতভাবে আঘাত করে। তাই সর্বতোভাবে একে সহজ করে ফেলাই ভাল, নইলে হয়তো একদিন তার সমস্ত সত্তাকেই এরা গ্রাস করে ফেলবে। আর তখন করারও থাকবে না কিছু।

কিন্তু সহজ করতে করতেও কিছুটা সময় গেল কেটে। মনটাকে প্রস্তুত করতেও সাধ্যসাধনা করতে হ'লো অনেক। এবং অবশেষে

মনের সমস্ত অবসাদ ও অনিচ্ছা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একদিন বিকেলে অরুণা উপস্থিত হ'লো অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের বাড়ী।

অধ্যাপক রায় যতটা আনন্দ বোধ করেছেন অরুণার আসাতে, তারচেয়ে একটু বেশী প্রকাশ করলেন, এবং বললেন, 'শেষ পর্যন্ত এলে তাহ'লে—' অধ্যাপক-গিন্নীর ডাক পড়লো। অরুণার মুখে স্মিতহাসি শুধু।

অধ্যাপক রায় বলতে লাগলেন, 'ঠিক সময়ে এসেছ যা হোক; একটু বাদে এলেই আর পেতে না আমাকে।' তারপর কি এক গভীর অর্থ ও প্রাজ্ঞ হাসি মিশ্রিত করে বললেন তিনি, 'কি যে বলবো তোমাদের—যাক্'। কথা শেষ করলেন না, ঘাড় নাড়লেন তার বদলে।

অরুণা স্থির করেই এসেছিল, নিঃশব্দ ভূমিকা ছাড়া আর কোন অংশই সে গ্রহণ করবে না আজকের সাক্ষাৎকারে।

অধ্যাপক-পত্নী অরুণাকে বাড়ির ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'উনি ভাই কেবল তোমার কথাই পাড়েন রাতদিন।'

অরুণার মনে হ'লো বলে, উনি তো বললেন আপনিই ব্যাকুল আমার কথা ভেবে ভেবে। কোনটা সত্য তাহ'লে? কিন্তু প্রকাশ্যে উচ্চারণ করলো না একটি শব্দও, শুধু নিঃশব্দ হাসি ঠোঁটে।

ভেতর বাড়িতে এসে অধ্যাপক-পত্নী খাবার তৈরীতে মন দিলেন। অরুণা অধ্যাপক রায়ের শোবার ঘরে একটা চেয়ারে বসলো। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক রায়ও উপস্থিত হ'লেন সেখানে। বিছানায় কাত হয়ে শুতে শুতে অধ্যাপক রায় প্রশ্ন করলেন, 'তারপর খবরটবর বলো, অরুণা।' অধ্যাপক রায়কে মনে হয় অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, আর হাসিখুসী। আপনা থেকেই যেন তা

উপচে পড়ছে। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। তারপর চশমাটা অঙ্গুল দিয়ে ঠিকমত বসালেন।

অরুণা আর নীরব থাকাটা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মনে করে ধীরে ধীরে শুধালো, 'কি খবর স্যার ?'

'এই তোমাদের ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রোলেটারিয়েট, না কি বল ওটাকে'।

কথায় যেটুকু শ্লেষ ছিল তার উত্তরও ততটুকু শ্লেষ মিশিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু অবস্থা ও পাত্রভেদে অরুণা আপাতত ততটুকু শ্লেষে অসমর্থ ; তাই সে চুপ করে রইলো। রায়ও এদিকটায় আঘাত করা সমীচীন বা সুবিধাজনক নয় মনে করে কথার মোর ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'এভাবে নিজেকে ক্ষয় করে দিয়ে কী যে আনন্দ পাও !'

অরুণা আশ্চর্য হ'লো। 'ক্ষয় ? আমার তো মনে হয় সৃষ্টিই করছি নিজেকে।' 'ছাই করছো। সৃষ্টি করছো বুঝলে তো ভালই বলতাম। করার মধ্যে নিজের সমস্ত শক্তির আর প্রতিভার অপচয় করছো। আচ্ছা, তোমার আর্টসের চর্চা ক'ঘণ্টা কর তুমি দৈনিক ?'

'রোজ তো করতে পারি না।' অরুণার ভীত উত্তর।

'তাহ'লেই দেখ আমার কথা সত্য কিনা। শিল্পকলা হ'লো গভীর সাধনার জিনিস। গভীর সাধনা না হ'লে কখনো তা সার্থকভাবে রূপায়িত করা চলে না। অথচ যতসব আজেবাজে কর্মে সময় নষ্ট করে এ দিকটাকে ক্ষয় করে চলেছো,—' রায় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

অরুণা চুপ করে রইলো।

রায় পুনরায় বলতে লাগলেন, 'বলতে পার, আমার কি দরকার এ সব কথা বলে। ঠিকই। তবে কি জানো, তোমার কলাকৌশল দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই তো তোমাকে এসব বলা। নইলে

কে নিজের প্রতিভার অপব্যয় করছে সে সংবাদে আমার কি বলো ?'

অরুণা সহজভাবে আর তাকাতেও পারছিল না যেন। দেওয়ালে টাঙানো ফটোগুলোর ওপর সে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো।

'কি কথা বলছো না যে।'

অরুণা দৃষ্টি অবনত করলো, বললো, 'কি বলবো—'

'আমি যা বলছি ঠিক কিনা বলো।' রায় দাবী করলেন।

'আপনি যেদিক থেকে দেখছেন, সেদিক থেকে তো ঠিকই—'

'ব্যাস্ ব্যাস্; এর মধ্যে আর যেদিক টেদিক নেই। ও-ই একমাত্র দিক। নিজেকে সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনই কাজ নেই মানুষের।' স্বীকৃতি আদায়ের আনন্দে রায় উঠে বসলেন।

'কিন্তু—'

'কি কিন্তু ?' রায় সিগারেটটা ঠোঁটে লাগাতে যাচ্ছিলেন, নতুন প্রশ্নের আশংকায় সিগারেটটা হাতেই থেকেই গেল।

অরুণা ধীর সংযত ভাবে বললো, 'এটা কি খুব স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে না ?'

ত্রিদিব রায় জোর গলায় হেসে উঠলেন। হাসির ধাক্কায় প্রশ্নটা খুবই বোকার মত হয়েছে মনে করে অরুণা যেন সংকোচে মিশে যেতে চাইছিলো মেজের সংগে। রায় সিগারেটে টান দিলেন।

'স্বার্থপর ? হাসালে তুমি অরুণা, একেবারেই হাসালে।'

সত্য কি তাই ? অরুণা ভাবতে লাগলো। এত বোকা সে ?

'স্বার্থপর ? স্বার্থপর কে নয় বলো তো পৃথিবীতে ?' অধ্যাপক ত্রিদিব রায় হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলেন।

অরুণা আর কোন কথাই বলবে না, সংকল্প করলো।

'মানুষের সমস্ত কর্মের পেছনে আছে একটা স্বার্থবোধ, বুঝলে, মানুষের সমস্ত কিছুর পেছনে আছে স্বার্থবোধ। এতে লজ্জিত হবারও

কিছু নেই, বা অন্যায়ও কিছু নেই। এটা মানুষের একান্তই একটা সুস্থ মনোভাব। এ ছাড়া কোন কিছু হতে পারতো না। শিল্পকলা বলো, বড় বড় বিপ্লবের কথা বলো, বড় বড় আবিষ্কারের কথা বলো, সব কিছু কর্মেই মানুষ পরিচালিত হয়েছে তার স্বার্থচেতনা দিয়ে। এই যে তুমি রিলিফ না কি হিজিবিজি কাজে যোগ দিয়েছ, তারও পেছনে খুঁচিয়ে দেখলে দেখা যাবে ক্রিয়া করছে তোমার স্বার্থবোধ। তা যদি সত্য হয় তো একটু বেশী করেই না স্বার্থপর হ'লে নিজেকে সৃষ্টি করার জন্যে।' একটানা এতোগুলো কথা বলে অধ্যাপক রায় প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটায় শেষ টান দিলেন।

অরুণার মন ও চোখ দিক্‌বিদিক ঘুরতে লাগলো। আর নিজের প্রতি একান্ত সত্য ব্যবহার করে সে চুপ করে রইলো।

অবশেষে অধ্যাপক গিন্নিই বাঁচালেন অরুণাকে। খাবারের ব্যবস্থাদি সেরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তোমার বাপু যেন আর কাজ নেই কোন ; যে-ই আসে, তার সংগেই যত রাজ্যের বক্ বক্। দুটো মিঠে কথা বলা নেই।'

'তার জন্যে তো তুমিই রয়েছো।' অধ্যাপক রায় হাসলেন।

'থাক, আর ইয়ে করতে হ'বে না। এসো ভাই।'

'হেঁ যাও, ওর পচা হাতের খাবারগুলো গিলে এস। আমার তো বুঝলে এ খেতে খেতে জিভের স্বাদই নষ্ট হয়ে গেছে।'

অরুণা এবং অধ্যাপক-পত্নী দু'জনেই হাসলো। অধ্যাপক-পত্নী বললেন, 'ও খাও বলেই এত কথা বেরোয়, নইলে বেরুতো না।'

'তা যা বলেছ', অধ্যাপক রায় উত্তর দিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হ'লে অধ্যাপক-পত্নী বললেন, 'হাঁগা, আমাদের বাড়ীতেই না হয় একদিন ব্যবস্থা করো।'

অধ্যাপক রায় খুসী হ'লেন। বললেন, 'তা আর আমাকে বলছো কেন, তোমরা তোমরাই তো ঠিক করতে পার।' তারপর একটু থেমে দুষ্টুমি-ভরা ইংগিত দিয়ে বললেন, 'তা অরুণা হ'লো খ্যাতনামা শিল্পী, ও তোমার বাড়ীতে শো দিতে রাজী হ'লে তো!'

অরুণা লজ্জিত হ'লো। অধ্যাপক-পত্নী হাসলেন। বললেন, 'কি বলো ভাই, আমাদের প্রতি কৃপা করবে?'

'সে হ'বে'খন বৌদি একদিন।' অরুণা হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

'আজই না হয় হোক।' রায়-গিন্নি আব্দার করেন।

'হুঁ, আজকেই! তোমার যা বুদ্ধি—' রায় বলেন।

'অন্তত একটা গান।'

'না না, আজ কিছু হ'বে না। আমি বেরোচ্ছি এখনই।'

'তা তুমি যাও না কে আটকাচ্ছে তোমাকে?'

'হুঁ আমি যাব আর ও গান গাইবে এখানে। কিছুতেই হ'বে না তা। আমি বাড়ী পৌঁছে দেব ওকে।'

অধ্যাপক-পত্নী চুপ করে গেলেন। অরুণাও যেন তৃপ্তি অনুভব করলো মনে মনে। আর ভাল মনে হ'লো রায়ের অরুণাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার অফার। মনে হ'লো বাইরের স্থূলতার মধ্যেও যেন একটু সহৃদয়তা লুকিয়ে আছে কোথায়ও। আজকের এই এতটা সময়ের মধ্যে ঠিক এই মুহূর্তটিতে যেন অধ্যাপক রায় অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন নিজেকে। হ্যাঁ, ঠিকই, অরুণা সন্তুষ্ট হয়েছে।

ট্যাক্সিতে উঠে রায় ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হ'তে—অরুণারা ভবানীপুরে থাকে। ট্যাক্সি সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে এসপ্লানেডের দিকে ছুটলো।

বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দিনের আলো একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। বুঝিবা এই মিনিটে তা কোন এক অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুবে বিলীন হয়ে যাবে। চিরদিনের অতি সত্য অভিজ্ঞতা যেন কোন এক অজানা বিস্ময় নিয়ে কলকাতার বুকে ধীরে ধীরে নেমে আসবার জন্ম আপনাকে প্রস্তুত করে নিয়েছে পরিপূর্ণভাবে ; অপেক্ষা যা শুধু সঠিক লগ্নের, নির্দিষ্ট মুহূর্তের।

এই অজানা রহস্যের আগমন-ক্ষণটিকে সামনে রেখে ট্যাক্সিটা যখন পৌছালো চৌরঙ্গীতে তখন অধ্যাপক রায়ের এক অদ্ভুত খেয়াল হ'লো,—অন্তত তাই মনে হ'লো অরুণার। তিনি ভাব-চঞ্চল কণ্ঠে বললেন, 'কি হ'বে এই সময়ে ঘরে ফিরে অরুণা, তার চেয়ে চল একটু হাওয়া খাই। কেমন?' অরুণার উত্তরের কোন প্রতীক্ষা না করে তিনি যথারীতি নির্দেশ দিলেন ড্রাইভারকে। ট্যাক্সি রেড রোডে পড়লো, এবং দক্ষিণে ছুটে পালালো।

অরুণা যেন ভীষণ একটা ধাক্কা খেল মনে মনে। এমনি সময়ে এমনি আকস্মিকভাবে এমনি ধরণের সংকোচ-ভরা পরিবেশে নিজেকে ট্যাক্সিতে ছেড়ে দেওয়ার জন্ম সে প্রস্তুত ছিল না ; আরও বিশেষ করে অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের সংগে, যাঁকে তার মনের কোন অংশও কোনও ভাবে গ্রহণ করেনি কোনদিন। ইচ্ছে হ'লো, এই মুহূর্তে সে ট্যাক্সি থামাতে বলে, ইচ্ছে হ'লো রায়কে তাঁর খেয়ালখুসীর কল্পনার হাওয়ায় একলা ছেড়ে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু বলাও হ'লো না, পালিয়ে যাওয়াও না। আর বলাবলির কোন অপেক্ষা না রেখেই ট্যাক্সি নিজেকে ছুটিয়ে চলেছে অধিকতর বেগে। প্রায় নির্জন পথে তারও যেন নতুন প্রাণ এসেছে।

পশ্চিম দিগন্তের লালাভ বর্ণের চাকচিক্য অরুণাকে যেন রাঙিয়ে

দিয়েছে শেষ বারের মত; আর হাওয়ায় মাথার এপাশের ওপাশের নিয়ন্ত্রণ-না-মানা চুলগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে, আর কি এক রহস্যের ইংগিতে যেন আঘাত করলো অরুণার সর্ব-দেহকে। সেই ইংগিতের প্রভাবে অরুণা অনুভব করলো ভেতরকার ধাক্কাটা যেন ক্রমেই সহজ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মন যেন অস্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করলো; না, ঠিক এই সময়ে ট্যাক্সি থামাতে বলা যায় না, কোনভাবেই না।

এদিকে অরুণার মনে হ'লো, অধ্যাপক রায়েরও যেন কিভাবে মনের দ্বার খুলে গিয়েছে। হ্যাঁ, অধ্যাপক রায়েরও; ছাত্র মহলে যাঁর সাধারণ পরিচয় হ'লো যে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী জীবন-দর্শনের সমর্থক, এবং যে সমাজ ও সভ্যতা এই দর্শনের পরিপুষ্টির পক্ষে সহায়ক—অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা—সেই সমাজের সমর্থক ও ধারক। এই জীবন দর্শনের অনুরাগী হিসেবেই বর্তমান কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের প্রতিও তাঁর ন্যায্য সমর্থন তিনি জ্ঞাপন করেন সর্বতোভাবে। এই রায়েরও যেন মন হাওয়ায় দোল খেতে আরম্ভ করেছে। অরুণা আশ্চর্য হ'লো, সত্যি কি এমনি হয় মানুষের। এমনি কি আবেগে কাঁপে সেই মানুষগুলো, যাঁদের দেখতে বাইরের দিক থেকে স্থূল, যাঁদের জীবনদর্শনও সমালোচকের নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে ও বিচারে স্থূল? আগত সন্ধ্যার রক্তরাগ, হাওয়ার চাঞ্চল্য আর ঘনায়মান রহস্যের সূক্ষ্ম স্পর্শ কি তাঁদের স্থূল আবরণটাকেও ভেদ করতে পারে, পারে সেখানে এক তরঙ্গের সৃষ্টি করতে? অরুণা যেন আরও বেশী রকমের আশ্চর্য হয়ে গেল।

অধ্যাপক রায় তখন তাঁর বাছাই করা ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন, যে সব কবিতা এমনি পরিবেশে আপনা থেকেই আসে, আবার আপনা থেকেই যেন ফুরিয়ে যায়, আর যে

সব কবিতা বহুবার আবৃত্তিতে মনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গেঁথে গিয়েছে আর সেইজন্ম যাদের যাদের মাধুর্যও অনেকাংশে ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, তথাপি তারা ভিড় করে আসে মনে, আনন্দও জাগায় আর একটা বিশেষ ক্ষণকে আবেগে চঞ্চল করে দেয়। অধ্যাপক রায়কেও চঞ্চল করলো, ঠিক এই সময়টায় যখন ট্যাক্সিটা ছুটে চলেছে দক্ষিণে, সন্ধ্যার রহস্য নেমে আসতে আরম্ভ করেছে আর অরুণার মনের প্রথম বিস্ময়াবিষ্ট ধাকাটা সহজ হ'য়ে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন, হৃদয়ের কি এক সংগোপন খেলায়।

অরুণা বুঝতে পারলো এবং আশ্চর্য হ'লো।

টাক্সিটা তখন রেড রোড ধরে অগ্রসর হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে রেস কোর্সের গা ঘেঁসে মোড় নিলো, এবং শেষটায় আলিপুরের দিকে দ্রুত ছুটে গেল।

অরুণার মনে হ'লো পৃথিবী যেন প্রবেশ করলো আর কোন স্বর্গে।

অধ্যাপক রায় কবিতার ফাঁকে ফাঁকে কবিতার মতোই টুক্‌রো টুক্‌রো কথা বলে যাচ্ছিলেন। কত কথা। কিন্তু তার অধিকাংশই যেন প্রবেশ করলো না অরুণার কানে। মাঝে মাঝে একটা আধটা কথার রেশ তার কানে বাজে। অধ্যাপক রায় বলছিলেন, 'এই দেখা-না-দেখার আলোতে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে কী অদ্ভুত লাগে আমার, কী অদ্ভুত ভাল। তোমার লাগে না তা, অরুণা?—আঃ কী অদ্ভুত!'

অরুণা কোন উত্তর দিলো না, দেবার প্রয়োজনও ছিল না।

কিন্তু অনুভব করতে লাগলো যেন এই ভাল লাগার স্পন্দন। হ্যাঁ, অনুভব করতে লাগলো। কী যেন একটা ভাব ছড়িয়ে আছে এই হাওয়ায়, কী যেন অব্যক্ত কথা মিশে আছে অস্পষ্ট আলোয়, আর কী যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে মনে, অরুণা অনুভব করে। তার দেহের অণু-পরমাণুগুলোকে কে যেন জেগে ওঠার গান শুনিয়ে যাচ্ছে, কে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। দেহ পুলকিত হয়, মনটা যেন ওঠে নেচে। অরুণা আশ্চর্য হয়, এমনি অনুভূতি তো ক'মিনিট আগেও তার দেহ মনে ছিল না। কোথা থেকে এলো সে, কে বা দিলো এনে? এই পুলকিত চাঞ্চল্যের মধ্যেও সে যেন ভাবে।

অধ্যাপক রায় অরুণার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। হ্যাঁ, মন থেকে মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে। অরুণা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে নিজেকে, পরিবেশকে। ভাবতরঙ্গ অধ্যাপক রায়েরই অভীপ্সিত পথে বয়ে চলেছে; আর কিছুদূর অগ্রসর হ'লেই সমগ্র পরিবেশের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'বে। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, মনে কৌতুক অনুভব করলেন তিনি, আনন্দিত হলেন। অরুণার মনে এত সহজ প্রক্রিয়া তিনি যেন প্রত্যাশা করেন নি। সেজন্য বোধ হয় মায়াও হ'লো একটু। কিন্তু একে প্রকাশ করার তাগিদ নেই তাঁর, স্রোতের যে গতিপথ এভাবে সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তাকে চলতে দিতে হ'বে স্বকীয়ভাবে, তারপর বিশেষ কোন এক ক্ষণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে সব কিছুর উপর। সমস্ত দাবী আদায় করে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে সেই মুহূর্তটিকে, সেই কালকে। তিনি বলে ওঠেন এক সময়, 'কেন এমনিভাবে জেগে ওঠে মানুষের মন, বলতে পার অরুণা?'

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। কত বিচিত্র পথ অতিক্রম করে সে কোথায় চলেছে আর কোন খেয়াল নেই অরুণার।

খেয়াল নেই বলেই অধ্যাপক রায়ের প্রশ্নটা তার কানে গেল না। কি এক বিস্ময়কর প্রেরণা যেন সে অনুভব করছে। তার মনেও কি জাগছে কবিতা? সেদিনকার শো'র স্মৃতি জেগে উঠছে মনে। সেদিন কোথা থেকে কোন এক অনুপ্রাণনা এসে আন্দোলিত করেছিল তার হৃদয়কে—সৃষ্টির বেদনায় ও আনন্দে সে উঠেছিল কেঁপে। সেই কাঁপনের মত অনুভূতি জীবনে যেন আর কোনদিন সে অনুভব করেনি, জানেনি সে কোনদিন নিজেকে তেমনি করে, সেদিন জেনেছিল যেমন করে। আজকের এই মোটরে কেটে যাওয়া হাওয়ার স্রোত, অব্যক্ত আলোর স্পর্শ আর না-দেখা কাব্যের সুর যেন সেদিনের স্মৃতি নিয়ে আসবে বহন করে; যেন সেদিনের মত করে নিজেকে জানার আকূতি বেজে উঠছে হৃদয়ে। কি চায় সে? মিশে যেতে চায় কি হাওয়ার সংগে? এক হয়ে যেতে চায় কি অস্পষ্ট আলোকের জ্যোতির সংগে? বিলিয়ে দিতে চায় কি আর কোন সত্তায়? বুঝতে পারে না সে। কিন্তু অনুভব করে সেদিনের স্মৃতি, ডাক শুনতে পায় সেদিনের সত্তার।

আর কী আনন্দ এই অনুভূতিতে!

অধ্যাপক রায় অরুণার দিকে আবার তাকালেন; মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটে, আর মন যেন খুসীতে উপচে পড়তে চাইলো।

এদিকে ট্যাক্সি বহু পথ অতিক্রম করে, বহু পথ ঘুরে ফিরে লেকের ধারে বিচরণ করতে লাগলো, আর গ্রহণ করলো লেকের প্রশান্ত নিঃশ্বাস। বলা বাহুল্য, সর্বক্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রেই ট্যাক্সির গতি নিরূপণ করছিলেন অধ্যাপক ত্রিদিব রায়।

বহু মানুষের যাতায়াত আর বহু মোটরের ধ্বনিতে মনের আকাশ যেন অন্য রকম হয়ে যেতে লাগলো অরুণার। দেহের আর মনের চাঞ্চল্যের সংগে যেন সে অনুভব করলো একটা সুখকর উষ্ণতা। হ্যাঁ একটী প্রীতিকর তপ্ততা। দেহের অনুপরমাণুগুলো চাঞ্চল্যে তপ্ত হ'য়ে উঠলো নাকি তার? সৃষ্টির অনুভূতি আবেগের তীব্রতায় তপ্ত হ'য়ে উঠলো নাকি? অস্পষ্টভাবে নিজের মনকেই সে প্রশ্ন করলো।

একটু বাদে এই প্রশ্নটাই তাকে মাটীতে নামিয়ে দিলো; সে বুঝে দেখতে চাইলো তার নিজের অবস্থাটা। দেখলোও।

হ্যাঁ, সে দেখলো অধ্যাপক রায়ের ডান হাতখানা বেষ্টন করে আছে তাকে, আর তার দেহে এসে মিশেছে অধ্যাপক রায়ের দেহের উষ্ণতা।

চকিতে সরিয়ে নিলো সে নিজেকে। অধ্যাপক রায়ও বাধা দিলেন না, কোন। কিন্তু হাসলেন; এবং বললেন, 'তাই ভালো, বোকা মেয়ে—

* * * *

প্রথম একদিন এই অভিজ্ঞতা হওয়ার পর দু'দিন কী দুঃসহ এক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে কাটলো অরুণার। লজ্জা, সংকোচ, ভাল-লাগা, ভাল-না-লাগা ইত্যাদি নানাভাবে সে আন্দোলিত হ'লো। নিজের সংগে লুকোচুরি করে বেড়াল, কলেজ পালালো, অধ্যাপক রায়ের ক্লাশে গেল না, কিন্তু তবু সেদিনের অভিজ্ঞতা তার সমস্ত দুঃখবেদনা ও সুখানুভূতি নিয়ে—তার মনের সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে ক্ষণে ক্ষণে। আর নিজেকে মনে হয় অসহায়, হ্যাঁ অসহায়।

কেননা, সেদিনের চাঞ্চল্য যত না আনে আনন্দ, তার চেয়ে ঢের বেশী আনে বেদনা, আর এই বেদনার তরঙ্গে নিজেকে মনে হয় অসহায়, যেন শক্তি নেই তার কোন। তাই এই ভাব-সংঘাতের মধ্যে কোন একদিন সে ঠিক তেমনি পরিবেশের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেলো, আর ঠিক তেমনি করেই অনুভব করলো অধ্যাপক রায়ের দেহের উষ্ণতা।

এমনি করে দু'এক দিনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের সংগটা অরুণার কাছে সহজ স্বাভাবিক হ'য়ে এলে সে নির্মমভাবে হিসেব নিকেশ করতে বসলো নিজের সংগে। কেননা, সে নিশ্চিতরূপেই বুঝে নিয়েছে যে এই আলো-হাওয়ার দোলা খেয়ে খেয়ে সে অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে অধ্যাপক ত্রিদিব রায়েব, যে কাছে-আসার একটি মাত্রই অর্থ, একটি মাত্রই পরিণতি। চোখের সামনে আঁকা দেখতে পায় যেন সে ঐ পরিণতিকে। কিন্তু সর্বতোভাবে একে স্বীকাব করে নেওয়ার আগে সে বিচার করে দেখতে চায়, কি সে আর কি-ই বা অধ্যাপক রায়। কি তার আদর্শ, আর কি-ই বা অধ্যাপক ত্রিদিব রায়ের।

এতদিন ধরে অরুণা বিশ্বাস করে এসেছে যে সে নতুন সমাজ ও মানুষ সৃষ্টির কর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। সেই সমাজ সমস্ত মানুষকে স্বীকার করে পরিপূর্ণ মহিমায় তাদের প্রতিষ্ঠা করবে। সেই সমাজকে সৃষ্টি করবে সে তার কর্ম দিয়ে, আর সেই সমাজের উপযোগী শিল্প সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে সে তার শিল্প-কর্মের মাধ্যমে। এই বিশ্বাসই সে করে এসেছে নিজের সম্পর্কে, আর, তার মনে হয়, সে বিশ্বাস এখনও অটুট। কিন্তু অধ্যাপক রায়? অরুণার কোন সন্দেহ নেই যে, অধ্যাপক রায় এই আদর্শের এক বিন্দুও

কোন কালেই সমর্থন করেননি, করেন না এবং ভবিষ্যতেও কোন কালে করবেন না। তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে তিনি খোঁজে বেড়ান নিজেকে, আর তার সমস্ত কাজের মধ্যে অরুণা দেখতে চায় সমস্ত মানুষকে। স্পষ্টতই দুজন দুখানে দাঁড়িয়ে।

অথচ দুখানে দাঁড়িয়ে-থাকা দুটো মানুষ সম্পূর্ণ অন্য এক আকর্ষণে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। কি করে সম্ভব হ'লো সে প্রশ্ন অরুণা নিজেকে আর করলো না; সম্ভব হয়ে গিয়েছে, সেটাই চরম সত্য কথা। সে সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করলো, ভিন্ন আদর্শে গড়া দুটো মানুষের পক্ষে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কি সম্ভব ?

এই সমস্যাটাকে বিভিন্ন দিক থেকে মীমাংসা করতে চাইলো সে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করতে চাইলো। কিন্তু সমস্ত কিছু সম্ভাব্য মীমাংসা ও উত্তর ছাপিয়ে একটি কথাই তার মনকে দখল করে বসলো, কেন সম্ভব নয়? কাছাকাছি আসাটা যদি সম্ভব হয়ে থাকে তো দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় কেন ? সম্ভব নয় কেন কাছাকাছি থাকতে পারা ?

একটা প্রশ্নের উত্তর আরেকটা প্রশ্নের ভেতর দিয়েই দিলো সে। এই সমস্যা নিয়ে সত্যই খানিকটা বিচলিত বোধ করে সে, কারো সংগে আলোচনার ইচ্ছে হয়। কিন্তু ব্যাপার এমনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির যে আদর্শগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে যাদের সংগে তাদের সংগে নিজের মনের এই দিকটা প্রকাশ করতে রীতিমত সংকোচ হবে তার। আর সত্যি তো, সকলের কাছেই, এমন কি দিদির কাছেও, যে ব্যাপারটা মনে হ'বে একান্তই সৃষ্টিছাড়া, অপ্রত্যাশিত। তথাপি, নিজের কর্মের মাধ্যমেই হোক বা

আলোচনার ভেতর দিয়েই হোক, এর হ্যাঁ-না মীমাংসা একদিন তাকে করতেই হবে, রায় দিতেই হবে।

কিন্তু নিজের আদর্শকে খর্ব করবে না সে কিছুতেই, কিছুতেই না। আর অধ্যাপক রায়ের তো কথাই নেই, তাঁর আদর্শ-বিচ্যুতি সম্পূর্ণরূপেই অভাবনীয়। নিজের সম্পর্কেও এই অভাবনীয় শব্দটা ব্যবহার করে খুসী হ'লো অরুণা। আর এই খুসীর মধ্যে আপাতত সে রায় দিলো হ্যাঁ-এর পক্ষে। হ্যাঁ, হাঁ'র পক্ষে। সে জানে, তার কোন বন্ধুই একে স্বীকার করতে চাইবে না, হেসে বলবে অভাবনীয়। কিন্তু, নিজের জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত করবে এই সত্যকে, দেখাবে এই অভাবনীয় সত্যটা কত সহজ-ভাবেই ভাবনীয়।

সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠে অরুণার মন, আর এই দৃঢ়তার মধ্যে সে প্রতীক্ষা করে বিশেষ এক ক্ষণের, বিশেষ একটি সংগের।

এমনি একটা প্রতীক্ষিত মুহূর্ত যেন এসেও এলো না কমলার আজকের দিনে। কলোনীতে আসা অবধি বাইরে যায়নি সে কোনদিন। তাই একটা নির্জীব অবসাদ যেন পীড়া দেয় তাকে। আর কেন যেন ফেলে-আসা শিয়ালদা স্টেশনটাকে দেখতে ইচ্ছে করে, জীবন-নয় অবস্থাটা এখন কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে দেখার সাধ হয়; হয়তো বা একটু মায়াও পড়ে গিয়েছে কমলার। অন্তত তাই মনে হয় কমলার। এই জীবন-নয় অবস্থার উপর মায়া?—আশ্চর্য হয় সে।

তবু আজকেও যাওয়ার উদ্যোগ করেছিল সে।

কিন্তু এই নিরালা অপরাহ্নে বাধ সাধলো নিবারণ সাহা ; হ্যাঁ, নিবারণ সাহা, যাকে সাধারণত এমনি সময়ে কোনদিন দেখতে পাওয়া যায় না, সে-ই এসে মূর্তিমান প্রতিবন্ধকের মত দাঁড়ালো। বললো, 'কি রে যাচ্ছিস নাকি কোথাও ?'

কমলা দুঃখিত হয়েছিল। বিশেষ করে মন যেখানে বিশেষ করেই উদ্‌গ্রীব একটা অজানা হাওয়ায় নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তখন নিবারণকে সে মনে করেছে অপ্রত্যাশিত। তথাপি ফিকে হাসি হেসে সে উত্তর দিলো 'না, কোথায় যাব ? —এমনি।'

নিবারণের জন্য অর্থাৎ যে কোন আগন্তুকের জন্য মাদুর পাতাই ছিল। নিবারণ বসলো তাতে। কমলাদের ঘর তোলার ব্যাপারে কী অদ্ভুত খেটেছিল নিবারণ! কমলা সেই মুহূর্তেই জানিয়েছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে সে দেখেছে এই লোকটিকে, দেখেছে কী প্রগাঢ় তার আত্মবিশ্বাস, আর কী নিশ্চিত তার জীবনের প্রেরণা। কলোনীর প্রত্যেকটি বাসিন্দার সুখদুঃখের সংবাদ তার জানা, আর প্রত্যেকটি বাসিন্দাকে অনাবিল ভালবাসা ও বন্ধুত্ব দিয়ে ঘিরে রেখেছে সে, আর সর্ববিধ কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সে-ই অগ্রণী। তাই কোন পরিবারেরই নিবারণকে ছাড়া চলে না। সাহসে, প্রেরণায়, উদ্যোগ উদ্দীপনায় সে বাঁচিয়ে রাখে যেন সবাইকে।··কিন্তু কমলার যেন কেমন ভয় ভয় করে ওর সামনে। মনে হয় ওর সবকিছু-জানা চোখ নিশ্চয়ই জেনে ফেলবে তাকেও একদিন।

কমলার বাবা বাড়ীতেই ছিলেন। নিবারণের সংগে তাঁর আশা-নিরাশা আর সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের পরামর্শ চলে। নিবারণ

তাঁকে আশ্বাস দেয়, বলে, কেন মিছে চিন্তা করেন, আর—যা গেছে তো গেছেই—চিন্তা করে তো আর পাবেন না ফিরে।

কমলার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সমস্তটা উত্তর যেন লুকিয়ে থাকে এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই।

নিবারণ পুনরায় বলে, 'সদা রীতিমত ফিরি করতে যায় তো?'

কমলার বাবা ঘাড় নাড়েন। সদা কমলার ছোট ভাই। সত্যি নিবারণের প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না কমলার। কারণ, সেই নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সদা আর কমলার বাবাকে ফিরি করার পথ ধরিয়েছে। নইলে কি যে হতো। গা কাঁপে কমলার।

কিন্তু একটানা দীর্ঘশ্বাস আর প্রতিদিন-বলা দুঃখের কাহিণীর মধ্যে কোন সুখ পায় না কমলা; ফেলে-আসা স্মৃতির জন্য যেন কোন অনুরাগ নেই তার। সমগ্র জিনিসটাকেই, জীবন-নয় অবস্থারই একটা অপরিহার্য অংশ বলে মনে হয়। আর এই জীবন-নয় অবস্থারই প্রতিক্রিয়ায় মন তার ঘুরে বেড়ায় অন্য কোন আকাশে, খুঁজে বেড়ায় অন্য কোন স্বর্গ। কিন্তু কলোনীর মাটিতে বসে কোন স্বর্গের চিহ্নও দেখতে পায় না সে, কোন আকাশেও পাখা ছাড়তে পারে না মনের আনন্দে।

অগত্যা গৃহকর্মেই মন দিতে হয় কমলার।

কিন্তু কমলার বাবা ও নিবারণের সুখদুঃখের কাহিনী বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। অদূরে একটু কোলাহলের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, নিবারণ বুঝতে পারে সে আওয়াজটা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করে 'কি ব্যাপার?'

আগন্তুক কোলাহলকারী দল ওদেরই কলোনীর বাসিন্দা। সংখ্যায় সাত-আট জন। তাদের একজন উত্তর দিলো, 'দুইটা ইয়া ইয়া খোট্টা হরিপদর বৌকে—'

'এ্যা, কি করেছে ?'

'হরিপদর বৌকে শাসিয়ে গিয়েছে যে জায়গা ছেড়ে চলে না গেলে ঘরবাড়ী সব ভেংগে দেবে।'

'একথা বলেছে ? হরিপদ কোথায় ছিল ?' নিবারণের স্বরে গভীর উৎকণ্ঠা।

'হরিপদ বাড়ী ছিল না ; গোলমাল শুনে আমরা দু'জনে এগিয়ে গেলাম, গিয়ে জিগ্যেস করলাম, কে পাঠিয়েছে তোমাদের। ঐ শালারা বাপ-মা তুলে গালি দিতে আরম্ভ করলো—'

'গালি দিতে লাগলো ?'

'হ্যাঁ, আমারও শরীরটা গরম হয়ে গেল একটু, বললাম, তোমাদের কি, আমরা এখানে থাকি না থাকি তোমাদের কি ? এতে তেড়ে মারতে এলো ব্যাটারা—'

'তেড়ে মারতে এলো ? তা আপনারা কি করছিলেন ? দু'ঘা বসিয়ে দিতে পারলেন না ?' নিবারণ গর্জে উঠলো।

'বাঃ, আমরা—তো—'

'হয়েছে, রাখুন। এই সাহসেই আপনারা বাস করবেন কলোনীতে, না ? এই সাহস নিয়েই বাড়ী ছেড়েছেন, না ?'

আগন্তুক ক্ষুদ্র দলটি মাথা নীচু করলো। নিবারণ যেন পরিস্থিতিটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না, বুঝতে পারছে না খোট্টাদের তেল মাখানো লাঠির সামনে দাঁড়ানোর মত অস্ত্র ছিল না তাদের হাতে। অথচ না বুঝেই মিছে মেজাজ দেখাচ্ছে, এমনি একটা মনোভাব নিয়ে এরা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

নিবারণ জিগ্যেস করলো, 'খোট্টারা কোথায় ?'

'চলে গেছে।'

নিবারণ মনে মনে গর্জাতে লাগলো। না, এ ব্যাপারটাকে আর হালকা করে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কলোনীতে যে ইটপাটকেলের বৃষ্টি হয়ে থাকে তার সংগে খোট্টাদের আগমনের একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করলো নিবারণ। কোন ঘটনাই উপেক্ষনীয় নয়, কোনটাই একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই কারো না কারো নিশ্চিত নির্দেশে এসব ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে যদি না একে সর্বকালের মত প্রতিরোধ করে দূরে হটিয়ে দেওয়া যায়। সেজন্যই আজ সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে, সম্ভবত প্রস্তুত হওয়ারও। কারণ, বাঁচতেই হবে তাদের, বাঁচতেই হবে যে কোন মূল্যে। আর নিবারণ জানে, মার খেয়ে হজম করলে বাঁচা যায় না কখনও।

কলোনীতে দুষ্ট লোক লেগেছে, তা সে জমিদারের উস্কানীতেই হোক বা অন্য কোন লোকের গোপন নির্দেশেই হোক, দুষ্ট লোক লেগেছে, এটা সত্য। সুতরাং সমস্ত রকমের অবস্থার জন্য তৈরী থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়ে নিবারণ বিদায় দিলো আগন্তুক দলটিকে। আর নিজেও স্থির করলো, একবার পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটিতে গিয়ে সংবাদটা দিয়ে আসতে হবে, আর ইতিকর্তব্য সম্পর্কেও একটু বোঝা পড়া করে আসতে হবে। ঘরছাড়া বিপদের দিনে সহায় সম্বল না হলে চলবে কেন তাদের? কিন্তু উঠবার উদ্যোগ করতেই কমলা ডাকলো, 'নিবারণদা, চা—'

'চা? চা কেন আবার?'

শ্যামাঙ্গী মেয়েটা হাসতে লাগলো শুধু। নিবারণের ইচ্ছে হয়েছিল, চা না খেয়েই চলে যায়। কিন্তু কমলা আর কমলার বাবার অনুরোধে বসলো সে আবার, আর চোখ দুটো যেন নিজেরই অগোচরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় কমলার মুখের ওপর। কিন্তু অস্বস্তি বোধ হয় তাতে, তাই দুজনেই দুদিকে ফিরিয়ে নেয় চোখ।

চায়ে চুমুক দিয়ে নিবারণ বলে, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে রে, চমৎকার।'

মেয়েটি শুধু হাসে। আনন্দিতও হয় বোধ হয়, এমনি একজন মাধুর্যহীন শুধুই কঠোরতা দিয়ে গড়া মানুষের কাছ থেকে একটুখানি প্রশংসা পাওয়া যেন কম কথা নয়! এমনি মনে হয় কমলার। কৃতজ্ঞ হয় সে। এই মুহূর্তটিকে অবলম্বন করে সে পাখা মেলতে চায়, মনে হয়, আর কোন স্বর্গের স্পর্শ সত্যই হয়ত বা মিলবে একদিন। যেখানে কিছুই মিলে না, সেখানে দাঁড়িয়ে স্বর্গের অনুসন্ধান করে সে, আশ্চর্যও হয়।

চা শেষ করতে করতে নিবারণ বললো, 'তা কলকাতার পথঘাট ভাল করে চিনে নিস কমলা, নইলে কখন কোথায় আটকে যাবি—।'

কমলার স্বর্গ ভেংগে যায়। মনে হয়, কী অভদ্র এই লোকটা, কী কুৎসীত। ওর চোখে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। কিসের যেন মানে জেনে নিতে চায়। কী যাচ্ছে-তাই! কিন্তু এই চিন্তা মনে দানা বাঁধে না কমলার। তা-ই বা হ'তে যাবে কেন নিবারণ, কিসেরই বা সে মানে খুঁজবে। সে কি জানে, সে কি জানে? হয়তো কেন, নিশ্চয়ই এ শুধু স্নেহশীল সতর্কবাণী, হ্যাঁ দরদভরা আশংকা। অন্য কিছুই নয়।

নিবারণ বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে।

কমলার বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি যেন এলো। চটপট সে গুছিয়ে নিলো, এবং কলোনীর বাইরে পা ফেললো। এই প্রথম কলোনীর বাইরে পা দিলো সে। এই প্রথম। বিকেলের পড়ন্ত রোদ তখনো ম্লানভাবে চিক্‌চিক করছিলো, আর মৃদু সলজ্জ হাওয়া যেন সে ম্লানিমাকে বৃথাই ঢাকার চেষ্টা করছিলো। হয়তো কমলার মনও মিশে গিয়েছিলো সেই সলজ্জ হাওয়া আর ম্লান চাকচিক্যের সংগে।

শিয়ালদার জীবন-নগ্ন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলো কিছুই বদলায়নি এ কদিনে। নতুন কিছুই যেন ঘটেনি। জীবন-নগ্ন অবস্থাটা তেমনি কদর্যভাবে জীবন-নগ্ন রূপেই বিরাজ করছে, তেমনি বীভৎসভাবে, তেমনি উপেক্ষিত ভাবে। সেই জীবন-নগ্ন অবস্থার মধ্যে কার যেন দৃঢ় পদক্ষেপ মিলিয়ে গেল কমলার চোখের দৃষ্টির সংগে, কার উদ্ধত চলাফেরা। প্রত্যক্ষভাবে সে তো নেই চোখের সামনে, তবু তার উপস্থিতটা যেন উপলব্ধি করে কমলা। অস্পষ্ট পদক্ষেপটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'তে থাকে, ক্রমে সেটা একটা অতি চেনা বলিষ্ঠ মূর্তিতে পরিণত হয়। কমলা দেখে তাকে, স্পষ্টই যেন দেখে আর বুকটা কেঁপে ওঠে তার, কেঁপে ওঠে মনটা।

কিন্তু আরও সব মূর্তি ভিড় করে আসে—চেনা মূর্তিটাকে সরিয়ে দেয়। কমলার মনটা হালকা হয় যেন, কারো নিশ্চিত দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে না। অনেক মূর্তির অস্পষ্টতার মধ্যে ডুবে যায় সে। কিন্তু এই অস্পষ্ট মূর্তিগুলোও ধীরে ধীরে অপসারিত হ'তে থাকে। আরেকটা চিত্র সব কিছুকে ঠেলে আত্মঘোষণা করতে আরম্ভ করে। হ্যাঁ, আরও একটা চিত্র। কমলা যেন প্রতিরোধ করতে চায় এর আগমনকে, কিন্তু পারে না। তার প্রতিরোধ-ক্ষমতার চেয়ে ঐ আগন্তুক চিত্রটার শক্তি যেন বেশী, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে বেশী।

কমলা অনুভব করে মোটরের হাওয়া, স্বীকার করে প্রাসাদোপম বাড়ীর নির্জন চক্রান্ত, আর আস্বাদন করে দামী বিছানার তুল-তুলে স্পর্শ আর ইন্দ্রিয় গন্ধী-সুবাস। তারপর······আরও একটা সুতীব্র বেদনা। কমলা শিউরে ওঠে যেন, দেহের সর্বত্র যেন একটা আতংক কেঁপে ওঠে। মুছে ফেলতে চেষ্টা করে সে ছবিটাকে, চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় হৃদয়ের সূক্ষ্ম পটভূমি

থেকে। কিন্তু,···কিন্তু শক্তি নেই যেন কমলার, এর বিরুদ্ধে কিছুতেই যেন সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না নিজের সত্তাকে ; কিছুতেই পারছে না। প্রতি মুহূর্তেই যেন সে অনুভব করছে এর সুস্পষ্ট ইসারা, অবিচল আহ্বান।

সত্যই কি ডাকে তাকে কেউ ?··········

চিত্রে অনুভব করা সুবাস সত্য সত্যই অংগে মেখে আর মোটরের হাওয়া খেতে খেতে যখন কমলা সন্ধ্যার পর কলোনীর পথ ধরলো, তখন বার বার মনে পড়তে লাগলো চা-পানে রত নিবারণ সাহাকে। মনে পড়লো তার তির্যক কথাটাকে। এর মধ্যে কতটুকুই বা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, অথচ এই এতটুকু সময়ের মধ্যে কত গুরুত্বপূর্ণ কত কি ঘটে যায়, কত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। যা ঘৃণ্য কুৎসিত, তা-ই সত্য বলে গৃহীত হয়। কমলা বিস্মিত হয় ; নিজের উপরই যদি সে আস্থা স্থাপন না করতে পারে তো অন্যকে বিশ্বাস সে করবে কি দিয়ে ?

নিবারণ সাহা ও অমিয় দাস আনাগোনা করতে লাগলো কমলার মনে। এদের আসা যাওয়ায় যেন শক্তি ফিরে পায় কমলা, শক্ত হয় মন। কিন্তু, সেই চিত্রটা যখন শিয়ালদা স্টেশনের জীবন-নগ্ন পরিবেশে আঘাত করছিল কমলাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে, তখন কোথায় ছিল তার শক্তি, কোথায় ছিল নিবারণ সাহা আর অমিয় দাস ?

কলোনীর ত্রিসীমানায় পৌঁছানোর অনেক আগেই মোটর থেকে নামলো কমলা।

দশ

পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় কিছুতেই ডাঃ শচীশ সেনকে বোঝাতে পারছেন না যে, এই মুহূর্তে যখন ব্যাপক অরাজকতা দেশের মধ্যে মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে এবং যখন নাশকতাবাদী লোকেরা গভর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তখন গভর্ণমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করাটা কতখানি বিপজ্জনক ব্যাপার। হ্যাঁ, বিপজ্জনক; গভর্ণমেণ্টের পক্ষে, কংগ্রেসের পক্ষে এবং জনসাধারণ সকলের পক্ষেই বিপজ্জনক। নিঃসন্দেহ, দেশের অবস্থার অবনতি হয়েছে, মানুষের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে, গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মানুষ আরও বেশী কিছু আশা করেছিল, কিন্তু সংগে সংগে এটাও বিচার করে দেখতে হ'বে গভর্ণমেণ্টের হাতে মাল মসলা কত কম, আর একটানা একের পর এক কত ঝক্কি তাদের পোহাতে হ'চ্ছে। এই শরণার্থী সমস্যাটাই ধরা যাক না, তার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে কী না করতে হচ্ছে!

অথচ এই সাধারণ সত্যটাই ডাঃ সেন বুঝতে পারছেন না। বলছেন, 'একধারে সংবাদপত্রে ওদের জন্য কাঁদলাম, আবার অন্যদিকে আইনের সাহায্যে ওদের লাঠিপেটা করলাম, এ কেমন ধারা রাজনীতি?'

ঘোষ মহাশয় আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন; 'কোনটাই মিথ্যে নয় আমাদের কাছে,—আইনটাও নয়, দরদও নয়।'

নানা কারণে এবং চোখের সামনে সমস্ত রকমের অসংযত দুর্নীতির চিত্র দেখে এমনিতেই ডাঃ সেন চরম বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে-

ছিলেন। কেননা, সেটা স্পর্শ করেছে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও। নিজের ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শকে বাঁচানোর জন্যই তিনি যেন বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছেন। বললেন, 'কিন্তু মুখে দরদ দেখিয়ে আইনে তা অস্বীকার করলে এর মূল্য কি থাকে বলুন?'

'থাকে না-ই বা কি করে বলো।' ডাঃ সেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে ঘোষ মহাশয় বলতে লাগলেন, 'যুগ যুগ ধরে যা চলে আসছে তা-তো গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করতে পারে না, বা বিনাশ করতে পারে না। আইন তাকে রক্ষা করতেই হ'বে, যতদিন তা আছে। তাই—'

'তা হ'লে আইনই রক্ষা করুন, দরদের কথা বলবেন না।'

'মানে?'

'মানে—দুটোকে আপনি কি করে রক্ষা করবেন এক সংগে। একটাকে বাদ না দিয়ে আরেক টাকে—'

'এইতো বুঝতে পারলে না কথাটা।'

'খুব বুঝতে পেরেছি—দুটো কিছুতেই সত্য হ'তে পারে না। হয় দরদ, নয় আইন, দুটোর একটা নিশ্চয়ই মিথ্যা।'

'আমি বলছি দুটোই সত্য আমাদের কাছে। আমরা কোনটাকেই অস্বীকার করি না, শুধু চাই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে। রিফিউজিদের প্রতি আমাদের দরদ আছে বলে তারা যেখানে সেখানে বাড়ি ঘর তুলে বসবে, আর তাই আমাদের মানতে হ'বে? সেটা কি কোন যুক্তি হ'লো?'

গভীর বিরক্তির মধ্যেও ডাঃ সেনের হাসি পেল। যাদের নামে মানবতার দোহাই দিয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হয়, জনকয়েক স্ফীতোদর ব্যক্তির স্বার্থের খাতিরে তাদেরই উপর লাঠি

ঘোষ মহাশয় বলে চলেছেন, 'সাধারণ লোক অথবা সরকার বিরোধী পক্ষ সমস্ত দিক বিবেচনা করতে না চাইতে পারে, কিন্তু তোমরাও যদি সমস্ত দিক বিবেচনা না করে গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা কর, তাহ'লে আমরা ভরসা করবো কার উপর, কার কাছে সহযোগিতার জন্ম নির্ভর করবো বলো তো শচীশ।'

ঘোষ মহাশয় থামলেন একটু; তাঁর বক্তৃতার কোন ক্রিয়া হ'চ্ছে কিনা, এতদিনকার বিশ্বস্ত কর্মী পুনরায় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠছে কিনা, অথবা যে প্রভাব ঘোষ মহাশয় তাঁর সহকর্মীদের উপর এতকাল বিস্তার করে এসেছেন, সেই শক্তি আজ এই বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কার্যকরী হ'চ্ছে কিনা, তা বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ডাঃ সেনের মুখের উপর কয়েক সেকেণ্ড দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারলেন না তিনি। ডাঃ সেন নির্বিকার, কে যেন তাঁর চোখ ও মুখের পরিচিত রেখা থেকে সমস্ত ভাব ও ভাষা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু ঘোষ মহাশয় দমলেন না, তিনি আবার স্থরু করলেন, 'আর কংগ্রেসই বা ভরসা করবে কাদের? যে কংগ্রেস তোমাদের মত কর্মীর—'

কিন্তু ঘোষ মহাশয় তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না। কারণ, সেই সময়ই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো সাধারণ ও প্রাইভেট বৈঠকখানার মধ্যবর্তী দরজার দিকে। সেখানে শিয়ালদা স্টেশনের কেনাবেচার খ্যাতনামা বেপারী হারাণ দাঁড়িয়ে। ভেতরে একটা গভীর কিছু আলোচনার গন্ধ পেয়ে সে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। ঘোষ মহাশয় বললেন; 'একটু অপেক্ষা কর, কেমন?' এবং তার পর ডাঃ সেনের দিকে ফিরে বললেন, 'তা কি বলছিলাম যেন—'

ডাঃ সেন পূর্বকার মত নির্লিপ্ত ভাবে বললেন, 'থাক, আর বলতে

হবে না কিছু, ভবিষ্যতে এদের মত লোকই তো কংগ্রেস চালাবে।' বলে তিনি হারাণের চলে যাওয়া মূর্তিটার প্রতি ইংগিত করলেন। একটুও উত্তাপ নেই, উত্তেজনা নেই তাঁর কণ্ঠে। একটুও তীব্রতা নেই তাঁর ভাষায়, নেই একটু চাঞ্চল্যও।

অথচ ঘোষ মহাশয় অনুভব করলেন, যেন তাঁর সমস্ত শক্তি লোপ পেতে বসেছে। এই মাত্র কি একটা সুতীব্র আঘাতে যেন তাঁর শরীরের উত্তাপ নিভে আসছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এই দ্বিতীয়বার একটা বেদনাদায়ক স্তব্ধতা নেমে এলো ঘোষ মহাশয়ের প্রাইভেট বৈঠকখানায়। কিন্তু এই স্তব্ধতায় যেন শান্তি নেই, নিরুদ্বেগে নিঃশ্বাস ফেলা যায় না এতে। কেমন যেন দম আটকে যেতে চায়।

এমনি অবস্থায় ডাঃ সেনের সঙ্গ ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠে; আর কোনও একটা কথা বা কাহিনীর মধ্যে এই প্রীতিহীন আবহাওয়াটাকে ডুবিয়ে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না দেখে ডাঃ সেন বিদায় নেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু মন সরছিল না যেন, কেন না, যে সঙ্কল্প নিয়ে আজ তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা তো বলার মতো সুযোগ হয়নি ডাঃ সেনের। অথচ আলোচনাটা একটা বদ্ধ স্তরে এসে জমে গিয়েছে। ভাবলেন, চলে যেতেই হয় অগত্যা।

কিন্তু যেতে হ'লো না শেষ পর্যন্ত। যাওয়া না-যাওয়ার দোদুল্যমানতায় যখন দোল খাচ্ছেন ডাঃ সেন, তখন সুজাতা মুখার্জি প্রবেশ করলো ঘরে, চোখে মুখে একটা বিশুষ্ক আতংকের ভাব নিয়ে। ডাঃ সেনের দিকে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে সুজাতা বললো, 'শচীশদাও আছেন এখানে, যাক ভালই হ'লো।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘোষ মহাশয়ের চোখ ডাঃ সেনের দৃষ্টি-পথে গিয়ে মিললো, কিন্তু দুজনেই ফিরিয়ে নিলেন চোখ।

সুজাতা বলতে আরম্ভ করলো, 'হ্যাঁ পঞ্চাননদা, এর একটা প্রতিকার না হ'লে আর কিছুতেই চলছে না, না কিছুতেই না—'

ঘোষ মহাশয়ের গলা আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল, এবার যেন আর্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের ভাই ?'

'—শিয়ালদা স্টেশনকে কেন্দ্র করে কি যে চলেছে আর কি যে না চলেছে, তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। অথচ এর একটা—'

ঘোষ মহাশয় পুনরায় আহত হ'লেন যেন। সুজাতার কণ্ঠেও কি আজ শচীশের অভিযোগ ধ্বনিত হ'বে ? আশঙ্কায় মন যেন তাঁর কেঁপে উঠলো। যতই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাক না কেন তাঁর, শিয়ালদার কেনা বেচার ব্যবসায়ে তাঁর সংস্রব আছে, এ কথা ভেবে লজ্জিত না হ'য়ে পারেন না তিনি; অপরিসীম অবমাননার কাল মেঘ তাঁর মুখের সমস্ত সজীবতা যেন ঢেকে দেয়। সেই মেঘ-ই কি নিয়ে এসেছে সুজাতা? ডাঃ সেনের মুখে স্মিত হাসি।

'—অথচ এর একটা প্রতিকার না হ'লে কাজ করা আমাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজ করা যাবেও না হয়তো আর।'

শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্নের আশায় নিষ্ফল অপেক্ষা করলো সুজাতা। তারপর বলতে লাগলো, 'যত সব আজেবাজে লোক আজেবাজে প্রতিষ্ঠান কোন লাইসেন্স নেই কিচ্ছু নেই, কারো কোন কন্ট্রোল নেই কিচ্ছু নেই, তারাই আজ জাঁকিয়ে বসেছে রিলিফের নামে—যত সব ইতরের দল, এরাই দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছে শিয়ালদায়—'

ঘোষ মহাশয়ের বিবর্ণ মুখমণ্ডল যেন আরও মলিন হয়ে গেল, আর ডাঃ সেনকে মনে হ'লো যেন আরও একটু প্রফুল্ল।

'—তা ছাড়া এরা আমায় অপমান করেছে পঞ্চাননদা, সকলের সামনে আমায় অপমান করেছে।'

সুজাতার গলার আওয়াজ যেন লুকানো অশ্রুতে ভিজে গেল। অত্যন্ত করুণ মনে হ'লো তার কথা। ঘোষ মহাশয় রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, ডাঃ সেনও চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকালেন সুজাতার দিকে।

সুজাতা আরও একটু ভিজে সুরে বলতে লাগলো, 'সেদিনের ছোকরা, কি বুঝে পলিটিক্সের, কি বুঝে রিলিফের,—তার এতোখানি সাহস সে কিনা আমায় বলে আপনার মত অর্গানাইজার পেলে—' ভেতরে একটা শ্বাস-রোধ-করা জ্বালা অনুভব করলো সুজাতা। তাই কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। রুমালে চোখের কোণ ও কপালেব ঘাম মুছলো সুজাতা। আর তাকালো একবার ঘোষ মহাশয়ের পানে, আরেক বার ডাঃ সেনের দিকে।

একটু একটু করে সন্দেহ দেখা দিতে লাগলো ডাঃ সেনের মনে। প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কাদের কথা বলছো, স্পষ্ট করে বলো তো?'

'কেন, অমিয় না কি নাম ওর, পূর্ব-বাংলা রিলিফ কমিটির লোক।'

ঘোষ মহাশয় জ্বলে উঠলেন। তাঁব মনের ও চেহারার সমস্ত বিবর্ণতা এক মুহূর্তে অপসারিত হয়ে তাঁর দেহ মনকে যেন একটা অব্যক্ত স্ফূর্তিতে চঞ্চল করে দিলো। তিনি বললেন, 'তারা তোমাকে অপমান করেছে, তারা?'

সুজাতা ঘাড় নাড়লো।

ডাঃ সেনের প্রফুল্লতা একটা নিশ্চিত আশংকায় পরিণত হ'লো।

'আমি এর প্রতিকার চাই পঞ্চাননদা, প্রতিকার চাই—' সুজাতার কণ্ঠে বিনম্র আকূতি, ভেংগে-পড়া আবেদন।

ঘোষ মহাশয় সান্ত্বনা দেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'আপনাদের উচিত নয়, এইসব প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে দেওয়া। আর শুধু এরাই নয়, এদের মত আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা প্রকাশ্যে গভর্ণমেণ্টের এবং কংগ্রেসের নিন্দা করে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে এরাই গোপনে গোপনে কত কি করে বেড়াচ্ছে—'

শান্তকণ্ঠে ডাঃ সেন বললেন, 'খুব সন্তুষ্ট হ'লাম তোমার কথা শুনে।'

'তার মানে?'

'না, খু—বই সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার কথায়।'

সুজাতা ফ্যাল-ফ্যাল তাকিয়ে রইলো ডাঃ সেনের দিকে। এই অস্বস্তিকর কটাক্ষ থেকে সুজাতাকে আড়াল করার জন্যে ঘোষ মহাশয় তাড়াতাড়ি বললেন, 'কিন্তু কি করা যেতে পারে, বলো তো।'

সুজাতা বললো, 'না, না, আমি সত্যই বুঝতে পারলাম না আপনার কথা, শচীশ দা, সত্যই না।'

পুনরায় ঘোষ মহাশয় এগিয়ে এলেন; বললেন, 'থাক ভাই ওর কথা, ও বুঝে কাজ নেই তোমার, বলো তো কি করা যায়?'

শুধু একটা ওঃ উচ্চারণ করে সুজাতা বোঝা-না-বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেল, এবং তারপর বললো, 'আমার মনে হয়, গোটা কয়েক সিলেক্টেড প্রতিষ্ঠানের ওপরই গভর্ণমেণ্টের নির্ভর করা উচিত, আর এদের মত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত শিয়ালদা স্টেশন থেকে—এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

'তাড়িয়ে-দেওয়াদের মধ্যে তোমাদের নাম সকলের আগে করলে পারতে সুজাতা।'

'What do you mean?' সুজাতা গর্জে ওঠলো। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ঘোষ মহাশয় বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু ডাঃ সেন সে ধার দিয়ে গেলেন না, অথবা সুজাতার প্রশ্নের কোন জবাবও দিলেন না। নিঃশব্দে চেয়ার থেকে উঠলেন, বললেন, 'আচ্ছা, নমস্কার পঞ্চাননদা' এবং কোন কথার অপেক্ষা না করে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

হতভম্ব ঘোষ মহাশয়ের হাত দুটো অর্ধেক উঠে নেমে গেল। শচীশ তো কোনদিন এভাবে তাঁকে নমস্কার করে না; পারস্পরিক নমস্কার বিনিময়ের মত অপরিচিত তো তাঁরা নন। তাহ'লে, এর মানে? চোখের সামনে সরে-যাওয়া মূর্তিটার পানে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আবার একটা বিরাট স্তব্ধতা ও বেদনাদায়ক নীরবতা নেমে এলো ঘরে। ঘোষ মহাশয় ও সুজাতা পরস্পর-মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

জীবনে এই প্রথম যেন ঘোষ মহাশয় একটা নিশ্চিত ব্যবধান অনুভব করলেন তাঁর নিজের এবং ডাঃ শচীশ সেনের মধ্যে।

এগার

ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

টেলিফোন বাজছে ঘোষ মহাশয়ের বৈঠকখানায়। একান্ত উদ্বিগ্ন মনে ডাঃ শচীশ সেন তা লক্ষ্য করছেন, কানে শুনছেন। কেন যেন মন তাঁর আজ অস্বাভাবিক রকমের অস্থির—পায়ের তলা থেকে বিশ্বাসের মাটি কিছুদিন আগে থেকে সরে যাচ্ছিল, ঝড় বইছিল বুদ্ধির আলোড়নের। কাজ উৎসাহহীন, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গ প্রেরণাহীন, মন্ত্রীরা প্রীতিহীন। তথাপি ঘোষ মহাশয়ের বৈঠকখানায় তিনি মাঝে মাঝে দেখতে পান নিজেকে, বিস্মিত হন। জিগ্যেস করেন নিজেকে, কে টানে তাঁকে এখানে? কি?

ক্রিং......। সেক্রেটারী ফোন ধরলো, হ্যালো।

'না, তিনি এখনো নামেন নি।'

'আচ্ছা, ধরুন একটু।'

মিনিট দেড়েক বাদে এলেন ঘোষ মহাশয়। ডাঃ সেন নিশ্চল, নিশ্চুপ। তাঁর প্রতি ঘোষ মহাশয় তাকালেন একবার, কিন্তু হাত দিলেন ফোনে। চোখ অপ্রসন্ন, মুখ নিষ্প্রভ।

'হ্যালো, বলুন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে। কি করতে চান আপনি?'

ফোনে কি কথাবার্তা হ'লো ডাঃ সেন তা বুঝতে পারলেন না, কিছুক্ষণ ঘোষ মহাশয়কে শুধু হুঁ, হুঁ করতে শুনলেন। তারপর ঘোষ মহাশয় বললেন, 'আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি, গভর্ণমেণ্টের আইন আপনার পক্ষে—'

একটুখানি ছেদ।

'সুতরাং আইন যখন আপনাকে সমর্থন করে, তখন ব্যক্তিগত ভাবে কেউ আপনাকে সমর্থন করুন বা না করুন তাতে কি যায় আসে?'

আরও একটু ছেদ।

'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি তো সমর্থন করলেও আছি, না করলেও আছি।'

আরও একটু।

'কবে করতে চান? আজই?……… দেখবেন, পারলে জীবন নষ্ট করবেন না।………আচ্ছা, নমস্কার।'

ঘোষ মহাশয় ফোন রাখলেন। মুখ গম্ভীর। এই কথাবার্তার পেছনকার রহস্য কি, কি তার আকার, কি তার ইংগিত তা ডাঃ সেন বুঝতে পারলেন না। মনকে প্রসারিত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্পষ্ট হ'য়ে কিছু ধরা দিল না। দুর্ঘটনার অস্পষ্টতায় যেন চারিদিক আবৃত। ঐ আবরণের কিনারায় যেন আগুনের লাল আভা। ডাঃ সেন তাকালেন ঘোষ মহাশয়ের পানে।

'কি ভাই শচীশ, চা খাবে?'

ডাঃ সেন বুঝতে চেষ্টা করেন ঘোষ মহাশয়কে। শাণিত তাঁর কটাক্ষ। ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক ঘনঘটার লক্ষ্যভেদ কি সহজ? ভাবেন। কিন্তু একটা সিগারেট ধরানোর ইচ্ছেও হয় না তাঁর।

ঘোষ মহাশয় আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন। বলেন, 'খবরটবর বলো শচীশ।'

'আপনি খবরের স্রষ্টা, আপনি বলুন।' দুজনেই হাসেন একটু। পরিমিত ম্লান হাসি। সহজেই মিলিয়ে যায় তা। মনের যে ফারাক ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কি একই সঙ্গে ম্লান হাসি হাসার

ওজন করা প্রীতি দিয়ে ভরানো যায়? না দূর করা যায়? না পারা যায় নিয়মমাফিক আদর আপ্যায়নে। বরং এভাবে ভরাতে গিয়ে যেন ব্যাবধানটাই যায় বেড়ে। অমিলের মাত্রাই যেন বাড়ে। অন্তত ডাঃ সেন তাই মনে করলেন ঐ মুহূর্তে। ফোনের অন্তরালে লুকানো কে ঐ লোকটি, কি চায় সে? মানুষের জীবনের কারবারী? না মৃত্যুর? চিন্তার মেঘ আপনা থেকেই নেমে আসে ডাঃ সেনের মুখের ওপর।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। আবার ফোন বাজে।

'হ্যালো, কে?'

'ও: ত্রিদিব? কি সংবাদ বলো।………হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ফোন করেছিলাম ডাঃ চ্যাটার্জিকে। তোমার প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ হ'লো—…এ্যা, তোমার বোন লিলি সাক্ষাৎ করেছিলো ওর সঙ্গে? কি বললো?……হুঁ হুঁ……তবে তো ভালই……আমার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তাতে তিনি বললেন, তোমার থেকেও তো অনেক সিনিয়র প্রফেসর আছেন; তাদের দাবীটাও তো আছে……হেঁ হেঁ কমপিটেন্সের কথা তো ওঁরাও বলতে পারেন। কমপিটেন্স না থাকলে প্রফেসরি করে চুল পাকালেন কি করে?………কি করতে বলো আমায়?……এ্যা? …আবার কথা বলতে?……আমার সঙ্গে তো আলাপ হলোই। তা ছাড়া লিলি যখন সাক্ষাৎ করেছে, আর ডাঃ চ্যাটার্জির প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছে তখন আর দরকারই বা কি?……হেঁ তাতো বুঝলাম, কিন্তু……এ্যা,….. এর মধ্যে আর কিন্তুকিন্তু নেই। আমার মুখের কথাই বেদবেদান্ত?……হাসবো না তো কি……ছেলেমানুষি করলে কি কলেজের প্রিন্সিপাল হওয়া যায়?………আচ্ছা আচ্ছা হ'বেখন।……আর শোন, তুমি বরং কাল একবার আমায় মনে করিয়ে দিয়ো।…আচ্ছা…আচ্ছা।'

ফোন রাখলেন ঘোষ মহাশয়। হাসলেন। বললেন, 'ত্রিদিব প্রিন্সিপাল হ'তে চায়—ত্রিদিব।' ডাঃ সেনও হাসলেন। মুহূর্তের জন্যে যেন ঘরটা হালকা হ'লো, লঘু হাওয়ার স্পর্শ লাগলো মনে। ডাঃ সেন বললেন, 'এখন তো আমাদের পালেই হাওয়া, ত্রিদিব প্রিন্সিপাল হ'তে পারবে না কেন ? বিশেষ করে আপনার আশীর্বাদ পেলে ?'

ঘোষ মহাশয় মৃদু হেসে চোখ ফিরালেন। ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

'হ্যালো,হেঁ হেঁ আমি। কি ব্যাপার ?'

ঘোষ মহাশয়কে একটু প্রসন্ন মনে হলো ডাঃ সেনের। একটু হাসি খুসী, দরদভরা। আশ্চর্য বোধ হ'তে লাগলো তাঁর। এ আবার কোন ইতিহাস রচনা করে চলেছে, কার ভাগ্যলিপি ?

'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা আমার কাছে যে লিষ্ট দিয়েছিলে তাই আমরা অনুমোদন করেছি।......কাদের কথা বলছো ? কোন কমিটি ?'

[ঘোষ মহাশয় ডাঃ সেনের পানে একবার তাকালেন, খুসির আলো যেন স্তিমিত হ'লো একটু]......'হ্যাঁ তোমরা তো ওদের নাম দাও নি, তাই ওরা তো বাদই পড়েছে।'

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ডাঃ সেন। ফোনে কথা বলছে সুজাতা মুখার্জি। শিয়ালদা স্টেশনের রিলিফ-কর্ম নিয়ে যে কলঙ্কজনক ইতিহাস লোকচক্ষুর অজান্তে সৃষ্টি হয়ে চলেছে, যে কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে বিশ্বাস করা কঠিন, সেই ইতিহাসেরই আরেকটি অধ্যায় বোধ হয় আজ রচনা হয়ে যাচ্ছে। ডাঃ সেন জানেন, যেসব সেবা প্রতিষ্ঠান স্টেশনে কাজ করার অনুমোদন লাভ করবে, তারা সরকার অনুরক্ত অথবা কংগ্রেস অনুরক্ত। এই দু'য়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব লোকের অর্থ ও লালসায় মানুষের ব্যবসা চলছে সেখানে, চলছে দুর্নীতির চোরাকারবার, তাদের কর্ম অপকর্মের প্রতি চোখ বুঁজে থাকবে ঐসব

প্রতিষ্ঠান। আর যারা খোলা চোখে এসব দেখবে, প্রতিবাদ করবে, তারা সরকারী অনুমোদন লাভ করবে না। নীতির চোরাকারবারে এরা প্রতিবন্ধক, তাই আগাছার মতো এদের সাফ করা প্রয়োজন। সুজাতা মুখার্জি বিশেষ করে কাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, তা-ও অনুমান করতে কষ্ট হ'লো না ডাঃ সেনের। ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয় মন, শরীর উষ্ণ হ'য়ে ওঠে, দৃষ্টি তীব্র। তথাপি উপায় নেই। মানুষের জীবন রক্ষার ভার যাদের ওপর, মারার অস্ত্রও বোধ হয় তাদের হাতেই সবচেয়ে বেশী।

'হয়েছে, হয়েছে। আমাকে আর ধন্যবাদ দিতে হ'বে না, দিতে হয়তো নিজেকেই দাও······স্টেট্‌মেণ্ট তো সব রেডি, আজই দস্তখত হয়ে ইস্যু করা হ'বে··· ·হেঁ, কালকের কাগজে দেখতে পাবে।······খুসী হলে তো? আজকালের মধ্যে তুমি একবার এসো না।······দাঁড়াও এনগেজমেণ্ট বইটা একবার দেখেনিই······হ্যালো, কাল নয়, পরশু বিকেলে ফ্রি আছি।······এসো, কেমন? আচ্ছা······আচ্ছা।'

ফোন রাখলেন ঘোষ মহাশয়। ডাঃ সেনকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেন। মনে মনে বললেন, নিরুপায়। এ তাঁর দৈনন্দিন কাজ, তাঁর জীবন। এখানে ব্যক্তিগত বিচারাচার, রুচি অরুচি, ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনই স্থান নেই, স্থান নেই মানুষকে খুসী করার বা আদর্শ রক্ষা করার। কালচক্র এমনিভাবেই বয়ে চলেছে, এর হাতে তিনি তো পুতুল। সাধ্য কি তার গতি নিরূপণের? এমনিভাবেই কোন মানুষের ইচ্ছার দাসত্ব স্বীকার না করে অলক্ষ্যে নির্মাণ হয় ইতিহাস, মানুষের জীবন। হোক শচীশ বিরক্ত, সে কি বোঝে না কালবিবর্তনের নিয়মই এই।

ঘোষ মহাশয় নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন। ডাঃ সেনকে অবলম্বন করে তাঁর চোখ ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেল।

অপরাহ্ন। অমিয় দাসের সার্পেণ্টাইন লেনের আলোর প্রবেশ-নিষিদ্ধ কোঠায় বিজয় চৌধুরী চুপচাপ বসে। অমিয়র স্ত্রী রান্নায়, বিশেষত বিজয়ের চা তৈরীতে ব্যস্ত। অনেক ভাবনা ও কথাবার্তার পর চা'টা পুরস্কার পায় বিজয়। ভাবনা পার হয়ে আসে দুর্ভাবনা, চিন্তার পর দুশ্চিন্তা।

'বুঝলে বৌদি', বিজয় একবার চেঁচিয়ে বলে, 'তোমার জীবনে কিছু হ'লো না বলে তুমি যেমন আক্ষেপ করো, তেমনি আমার মনে হয় আমাদের জীবনও বুঝি বা ব্যর্থই যায়!'

'সে কি কথা ঠাকুরপো, তোমাদের আদর্শ, বিশ্বাস?'—চায়ের কাপ নিয়ে আসতে আসতে উত্তর দেয় বৌদি।

'সে আদর্শ মেনে কি আর সব সময় চলতে পারি ভাই? এই দেখো না, আমার কথাই ধরো। আমার উচিত আমার সমস্ত কর্ম ফেলে দিয়ে আমার আদর্শকে সার্থক করে তোলার জন্য সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া। কিন্তু সে কি পারি? কলেজের প্রিন্সিপাল কে হবে না হবে সেই দুশ্চিন্তাই মনকে আজ করে রেখেছে আচ্ছন্ন।'

'বাঃ তার প্রভাব কি নেই তোমার জীবনের ওপর।'

'আছে বলেই তো দুশ্চিন্তায় ভুগছি—কে প্রিন্সিপাল হলে আমার চাকুরী থাকবে, আর কে হলে থাকবে না।'

'উঃ, তোমার চাকুরী আবার থাকবে না।'

'সত্যি, ত্রিদিব রায় প্রিন্সিপাল হ'লে আমার চাকুরী থাকবেই না। ও আমার, আমাদের দলের, পয়লা নম্বরের শত্রু।'

'কেন? কি করেছ তোমরা তাঁর?'

'কি করেছি আবার? কিছুই না। এ হ'লো আদর্শগত সংঘাত। তিনি একটি মতবাদে বিশ্বাসী, আমরা আরেকটিতে। তিনি মনে

করেন, আমাদের মতবাদ প্রচারিত হ'লে দেশ উৎসন্ন যাবে। তাই তিনি আমাদের নিগৃহীত করেন।'

'উঃ, ভারী বদলোক তো।'

'তা আর বলতে! সে দিন অরুণা সম্পর্কে যে কথাবার্তা হ'লো না, এ-ই সেই ব্যক্তি, ভয়ানক ইন্দ্রিয়পরায়ণ।'

'সেই লোক হ'বে কলেজের প্রিন্সিপাল?'

'হবে না? দেখতে পাওনা দেশের মন্ত্রীরা কি?' বিজয় উত্তর দিলো। অপরাহ্ণের নিভ্‌তে-থাকা আলোর মত ঘরের আলো ম্লান হ'তে থাকে—মন ভারী হ'তে থাকে। অনেক অনাস্বাদিতপূর্ব অভাব-অভিযোগ ও দুঃস্বপ্ন মনের গোপন খেয়াঘাটের এপার ওপারে যাতায়াত করতে থাকে। আলোচনার কপাট বন্ধ। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে। সময় মনে হয় অবরুদ্ধ।

অকস্মাৎ বিজয় লক্ষ্য করে, অমিয়র স্ত্রী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। 'হাসির কি হ'লো, বৌদি?' বিজয় শুধোয়।

'ভাবছিলাম, তোমার চাকুরী গেলে তুমি সংগ্রাম করবার সুযোগ পাবে। তুমি তো তাই চাও।'

বিজয় হাসলো। বললো, 'অন্তত তাই চাওয়া উচিত, কিন্তু পারি কৈ বৌদি।'

'পারবে ভাই, পারবে।' বলে রান্নায় মনোযোগ দিতে ছোটে অমিয়র স্ত্রী।

নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দেয় বিজয়। দুশ্চিন্তা চায়ের স্বাদ যেন দেয় নষ্ট করে। তাতায় না দেহ।

অমিয়র প্রবেশ। 'ও তুই আছিস?' বিজয়কে দেখে বলে ওঠে সে। 'আর হল না, এবার পাততাড়ি গুটাতে হয়।' অমিয়র স্বর নিষ্প্রাণ, রসহীন।

'মানে ? কি হলো ?

'পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটি শিয়ালদা স্টেশনে আর কাজ করতে পারবে না।'

'কেন ? কেন ?'

'সরকারী নিষেধাজ্ঞা। এইমাত্র কল্যাণ ফোন করছিল, গভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে একটা প্রেস স্টেটমেণ্ট ইস্যু করেছে, কোন্ কোন্ রিলিফ অর্গানাইজেশন শিয়ালদায়, কাজ করতে পারবে তার সম্পর্কে। লিষ্টে আমাদের নাম নেই।'

'কাদের আছে ?'

'বুঝতেই পারিস। কংগ্রেস, কংগ্রেস সমর্থিত, ও কয়েকটি কলেজ ইউনিয়নের রিলিফ কমিটি। কংগ্রেসবিরোধী কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত কোন সংঘেরই নাম নেই।'

'যতসব বদমায়েসী।' বিজয়ের স্বর উত্তেজিত। নইলে মেয়ে-মানুষ নিয়ে ভাল কারবার জমে না।

'আমার ইচ্ছে হয় ঐ সুজাতা মুখার্জিটাকে ধরে চাব্‌কাই। কী সুযোগই পেয়েছিলাম সেদিন।' অমিয়র ক্রোধ যেন ফেটে পড়ে।

'ইস্! মেয়েমানুষের ওপর জোর দেখানোর বাহাদুরি!' অমিয়র স্ত্রীর কণ্ঠ। কখন চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি কেউ। 'যে মেয়েমানুষ অন্য মেয়েমানুষের ইজ্জৎ বিক্রী করে, তাকে আচ্ছা করে পিটানোই উচিত।' অমিয় উত্তর দেয়।

বিজয় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, 'এবার সুরু হ'বে সরকারী হামলা। উদ্বাস্তুদের উপর যাতে আর কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাব না পড়ে তারই সব ব্যবস্থা। তৈরি থাকিস তোরা। কিন্তু কখন থেকে ঐ আদেশ বলবৎ হ'বে ?'

'কখন থেকে আবার! এই মুহূর্তে, অবিলম্বে।'

'অনিমাদের মহিলা সংঘ?'

'ওদেরও একই হাল। সব বাদ, বিলকুল।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এক কাপ চাও দেবে না?'

'তোরা কি করবি?'

'কাছাকাছি যারা ছিল তাদের সবাইকে ডেকে এনে এ বিষয়ে আলোচনা হ'লো। স্থির হ'য়েছে কাল আমাদের কাজকর্ম বন্ধ রাখা হ'বে, আর প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটা ডেপুটেশন পাঠানো হ'বে। ডেপুটেশনের ফলাফল জেনে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করা হ'বে।'

বিজয় চিন্তাকুলভাবে বললো, 'আপাতত অবশ্য এ ছাড়া কিছু করারও নেই। আমাদের ওপর অফেন্সটা না রাখাই ভাল। তবে আমার মনে হয়, এটাই শেষ নয়। এর পর অন্যরকম হামলা আসবে।'

'আশ্চর্য আর কি তাতে?' একটু থেমে অমিয় আবার বললো, 'কিন্তু আমি বলে দিলাম, এই উদ্বাস্তরাই একদিন সরকারের পতনের কারণ হ'বে দেখে নিস।'

সঙ্কল্প গর্জে ওঠে মনে। কিছু একটা করার সঙ্কল্প। কিছু একটা করা, যা দিয়ে শুরু করা যায় এই মিথ্যাচার, ন্যায়নীতির চোরাকারবার। আশ্চর্য! বিজয় ভাবে মনে মনে, রিলিফ মানে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ মন্ত্রীদের লালসার আগুনে উদ্বাস্ত মেয়েদের বিসর্জন দেওয়া! রিলিফ মানে দুর্নীতির হাট বসানো। এমনি হয়তো বা হ'বে এদের পুনর্বাসন। যেমনিভাবে বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে মেয়েদের ইজ্জৎ, তেমনি করে সম্ভবত বিক্রী হ'বে পুরুষদের হিম্মৎ। জমিদারদের ভাড়াটে লাঠির আঘাতে,

পুলিশের গুলীতে আর সঙ্গীনের খোঁচায়। এক হাজার মানুষের জীবনের মূল্য দিয়েও এক কাঠা জমির দাম হ'বে না। বদমায়েসদের লালসা পেয়েছে মেয়ে, আর জমিদারদের লালসা পাবে মানুষ। হয়তো সেদিনই হ'বে প্রকৃত পুনর্বাসন। অস্থির অমিয় আর কিছুতেই শান্ত হ'তে পারে না। ঐ একটুখানি ঘরেই পায়চারি শুরু করে, আর মাঝে মাঝে এটা সেটা মন্তব্য করে। বিজয় শোনে, হয়তো বা শোনেও না।

এমনি অবস্থায় কয়েক মিনিট কাটল। অমিয় চায়ের তাড়া দিলো একবার। ছেলেটাকে আদর করলো খানিক। খানিক বকলো আজেবাজে। ভাল লাগলো না। 'কি হ'লো তোমার—' বলে ভেতব দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় ঝড়ের বেগে পূর্ব-বাংলা রিলিফ কমিটির একটি স্বেচ্ছাসেবক 'অমিয়দা আছেন, অমিয়দা' বলে প্রবেশ করলো ঘরে।

'কি হ'লো, রাখাল ?'

'কলোনীতে গুণ্ডার আক্রমণ হ'য়েছে। শীগ্‌গীর চলুন।'

'কোথায় ? কোন কলোনীতে ?'

'মুরারীপুকুর এলাকায়, নিবারণ সাহাদের কলোনীতে। আগুনও দিয়েছে নাকি। শীগ্‌গীর চলুন।'

'চল। চল্‌লামরে।'

'চা খেয়ে যাও, চা—' স্ত্রীর কণ্ঠ।

'অমিয়—'

'সময় নেই এখন—' বলে ত্রস্তপদে অমিয় রাস্তায় নামলো। বিজয়ও নামলো। ছেলেটা 'আমি যাব, আমি যাব' বলে চীৎকার, পরে কান্না সুরু করলো। মা দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে। সার্পেণ্টাইন

লেনের আলোহীন রাস্তায় চলে-যাওয়া মানুষগুলোর পা বেশী দূর দেখা গেল না। ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

নিবারণ সাহাদের কলোনী তখন আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ছে। সন্ধ্যার মিটমিটে আলোয় প্রায়-নির্জন-হয়ে আসা পল্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গুণ্ডার দল—জমিদারের ভাড়া-করা লাঠিয়াল। টাকা দিয়ে এদের হৃদয় কেনা, লাঠির মত শক্ত নিষ্প্রাণ। জমিদারের লালসার মত শাণিত, লোলুপ। সেই লালসাই লাঠিয়ালের ক্রূর হুমকির ভেতর দিয়ে ফেটে পড়লো।

জমিদারের হুকুম তামিল করতে এসেছিল এরা, তামিল করেছেও। উদ্বাস্তু পল্লীর অসহায় টালির ছাউনি দেওয়া বাঁশ-বেড়ার ঘর ছিন্নভিন্ন হয়ে ধূলোর আশ্রয় নিয়েছে একের পর এক, একের পর এক পূর্ববাংলার ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের নবীন আশার সুখস্বপ্ন ধূলোয় গড়িয়ে পড়েছে। তাপিত হাওয়ার মত ঢেউ খেলে প্রবাহিত হয়েছে গুণ্ডার দাপট একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। ভয়ার্ত নারী ও শিশুর কান্নায় আর গুণ্ডার হুঙ্কারে মুখর হয়ে উঠেছে সারাটা অঞ্চল। ঘুম ভেঙে গিয়েছে রাতের পাখীর। কলরব করে পালিয়েছে এরা আশ্রয় ছেড়ে। উদ্বাস্তু পল্লীর কোণায় কোণায় জ্বলে উঠেছে ক্ষুধার্ত আগুন। ছুটাছুটি হৈ-হল্লা আর আর্তকলরব গ্রাস করে জেগে উঠেছে এর জিহ্বা।

কয়েক মিনিটের মাত্র ব্যাপার। তারপর গুণ্ডার দল আর নেই। আছে তাদের অত্যাচারের স্বাক্ষর।

তিনদিক থেকে শুরু হয়েছিল এদের আক্রমণ। গোলযোগ শুনে যারা এগিয়ে এসেছিল হামলা প্রতিরোধ করতে, তাদের অনেকের

মাথাই ফেটে চৌচির; এসেছিল নূতন ঘর বাঁধার আশায় দুঃসাহসী যুবকরা; তাদের রক্তে কলোনীর মরা ঘাসগুলো ভিজে সজীব হয়েছে। সব খোয়ানোর চেতনায় উদ্‌ভ্রান্ত মহিলারা শুয়ে প'ড়েছিল মাটিতে; আশা করেছিল, গুণ্ডার দাপট তাদের সত্যাগ্রহের নিকট হার মানবে। গুণ্ডার লাথি আর লাঠিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাদের দেহ, বিপর্যস্ত হয়েছে সম্ভ্রম, আর শিশুদের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গুণ্ডারা দিয়েছে সত্যাগ্রহের উত্তর।

কিছুতেই কিছু হ'লো না। শক্তিহীন মানুষের প্রতিরোধ কোন কাজেই লাগলো না। বিস্তর আহত হ'লো, বিস্তর রক্ত ঝরলো কিন্তু দু'চারটি বাদে উদ্বাস্তু পল্লীর একটি ঘরও দাঁড়িয়ে রইলো না, আগুনে ভস্মীভূত হ'লো অনেক। লালসার নিকট মালেরও দাম নেই, জানেরও না। তাই যা কিছু সম্বল এরা ঘর-ছাড়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তা এই জমিদারী লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হ'লো। হোক পতিত বা অকেজো, মানুষের জীবনের মত কি জমি মূল্যহীন? না রক্ষকহীন?

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই গুণ্ডা-লীলার সময় শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত পুলিশের কোন সাড়া পাওয়া যায় নি, হয়তো বা সেই মুহূর্তে এদের অস্তিত্বও ছিল না।

অমিয়রা যখন এসে পৌঁছালো, তখন স্থানীয় লোকজনের প্রচেষ্টায় আগুন প্রায় নিভে এসেছে। ওদের সংঘের স্থানীয় কর্মীরা তখন আহতদের সেবায় ও হাসপাতালে প্রেরণে ব্যস্ত। দেখতে পেল, কয়েকটি কর্মীও আহত। খোঁজ করলো সে নিবারণের।

গুণ্ডার মারে সে সংজ্ঞাহীন, হাসপাতালের পথে। খোঁজ তল্লাসীর মধ্যে অকস্মাৎ কমলাকে দেখতে পেল সে। পরণের

শাড়ির আঁচল ওর ছেঁড়া। হাত তার একটি আহতের মাথার রক্ত মোছানোয় রত।

নিমেষের জন্য ভাল লাগলো অমিয়র।

সেদিন রাত্রিতে মেসে ফিরে কল্যাণ ডায়েরিতে নোট নিল আজকের ঘটনার। ওর কাছে দুটো ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ। শিয়ালদা স্টেশনে রিলিফ সম্পর্কে সরকারী নিষেধাজ্ঞা, আর উদ্বাস্তু কলোনীতে গুণ্ডাদের আগুন।

দীর্ঘকাল স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইলো সে। এ যেন ওর কল্পনারও অতীত। যারা সহায়সম্বলহীন, শরণার্থী, তারা আশ্রয়ের বদলে পাবে আগুন, এটা যেন বহু দুশ্চিন্তা বহু দুঃস্বপ্নের মধ্যেও সে ধরতে পারে না। ভাবতে পারে না কোন্ অপরাধে এদের এই শাস্তি। কে বানালো এদের শরণার্থী, কে বানালো ভিক্ষুক? কে করলো এদের ঘরছাড়া? দেশ ভেঙ্গে যারা দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলো, তারা কি এইসব মানুষকে বলি দেওয়ার পরিকল্পনাও করে রেখেছিলো আগে থেকে?

বহু শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হ'তে থাকে ওর চিন্তা। একদিন ওর মনে হয়েছিল, দুই বাংলায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের কালে সময় যেন থেমে গিয়েছিল বাংলায়। আজ মনে হ'লো যেন সময় আবার চলতে আরম্ভ করেছে। হ্যাঁ, চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পারম্পর্যে আজ যারা সময়ের হাল ধরার সুযোগ পেয়েছে, তারা হয়তো বা পেছনের পথে হাল ঘুরানোয় চেষ্টা করবে অথবা থামিয়ে রাখারও চেষ্টা করবে। কিন্তু সময়কে কি পেছনে ফেরানো যায়, না থামিয়ে রাখা যায়। সম্মুখের পথে তা চলবেই চলবে।

উদ্বাস্তু কলোনীর অগ্নি-ভস্মের মধ্যে কি তারই স্বাক্ষর?

সমাপ্ত প্রথম খণ্ড